বিশেষ রচনা

শ্রীরামকৃষ্ণ ও জীবনের লক্ষ্য

স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ

ছাত্রজীবনে আমরা অনেকেই একটা রচনা পড়তাম 'তোমার জীবনের লক্ষ্য'। ইংরেজিতেও অনেক সময় Paragraph Writing আসত 'Your aim in life'। আমরা কী করতাম? আমরা বেশিরভাগই নিজের নিজের কাছে থাকা বাংলা রচনা বই বা ইংলিশ Grammar & Composition বই থেকে লেখকের লিখে দেওয়া লক্ষ্যকেই মুখস্থ করে নিজেদের লক্ষ্য বলে পরীক্ষায় লিখে দিতাম। সেখানে আমরা লিখতাম—ডাক্তার হতে চাই, ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই বা ব্যারিস্টার হতে চাই ইত্যাদি অর্থাৎ আমরা শিখতাম ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা ব্যারিস্টার হওয়াই জীবনের লক্ষ্য।

আর একটা কথা সেসব লেখায় থাকত যে, জীবনের অবশ্যই একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা চাই, নইলে জীবনে উন্নতি করা যায় না। পড়তাম A man without an aim in life is like a ship without a rudder। জীবনের যে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা চাই এতে কারও কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অন্যকিছু হওয়াটা জীবনের লক্ষ্য, নাকি লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপায়? একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয় তুমি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে চাও কেন? সে বলবে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারলে নাম-যশ হবে, অনেক অর্থ রোজগার করতে পারব বা বড়জোর বলবে মানুষের সেবা করতে পারব। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আসলে সে চায় তার নাম-যশ হোক, অনেক অর্থ হোক বা মানুষের যেন সেবা করতে পারে ইত্যাদি। তাহলে লক্ষ্য হল নাম-যশ বা অর্থ উপার্জন করা বা মানুষের সেবা করা, আর ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়াটা হচ্ছে সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায়। অবশ্য অন্য উপায়েও নাম-যশ বা অর্থপ্রাপ্তি বা মানুষের সেবা করা সম্ভব হতে পারে, তার জন্যে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

আবার যদি প্রশ্ন করা হয়, নাম-যশ চাও কেন? উত্তর হবে, তাতেই আমি আনন্দ পাব, তৃপ্তি পাব। অর্থ, অ-নে-ক অর্থ রোজগার করতে চাও কেন? উত্তর—সুখে বাঁচতে গেলে অনেক অনেক অর্থের প্রয়োজন, তাই। মানুষের সেবা করতে চাও কেন? — সেটাই আমার ভাল লাগে, তাতেই আমার আনন্দ।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে আনন্দ, তৃপ্তি, সুখে বাঁচা, ভাল লাগা—এগুলোই আসল লক্ষ্য। নাম-যশ, অর্থ, মানুষের সেবা—এগুলো উপায়, লক্ষ্য নয়। এভাবে মানুষের সব চাওয়াকেই বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আসলে সে শেষ বিচারে একটাই জিনিস চাইছে—আনন্দ। কোনো মানুষই নিরানন্দে থাকতে চায় না, সবাই জেনে বা না জেনে, এই আনন্দকেই খুঁজছে। আর যা খুঁজছে, যা তার অন্বিষ্ট তাই তার লক্ষ্য। অতএব জীবনের লক্ষ্য হল আনন্দে বাঁচা।

এখন প্রশ্ন হল, কেন সবাই আনন্দ চায়? আমাদের ঋষিরা আবিষ্কার করেছেন যে, আনন্দই আমাদের স্বরূপ। তাঁরা সানন্দে ঘোষণা করেছেন : "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।" অর্থাৎ আনন্দ থেকেই এই ভূতবর্গ জাত হয়, জাত হয়ে আনন্দের দ্বারা বর্ধিত হয় এবং অবশেষে আনন্দের দিকে প্রতিগমন করে ও আনন্দে বিলীন হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মূল তত্ত্ব বা সত্তা একটিই আছে, দ্বিতীয় আর কিছু নেই—একমেবাদ্বিতীয়ম্'। একথা আজকের প্রকৃতি বিজ্ঞানীরাও বলছেন, যদিও তাঁরা কোনোদিনই বাহ্য যন্ত্রপাতি সহায়ে সে সত্যকে আবিষ্কার করতে পারবেন না, পারবেন যে না সেকথাও অধিকাংশ বিজ্ঞানী স্বীকার করছেন। ভারতীয় অধ্যাত্ম বিজ্ঞানীরা অর্থাৎ সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা সে সত্যের নাম দিয়েছেন 'ব্রহ্ম'। তাঁদের আবিষ্কৃত সত্য হল : "জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ।" জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। এই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বলা হয়েছে—তিনি 'সৎ' স্বরূপ, 'চিৎ' স্বরূপ এবং 'আনন্দ' স্বরূপ—সচ্চিদানন্দ (সৎ+চিৎ+আনন্দ)।

'সৎ' স্বরূপ মানে নিত্য বর্তমান, অবিনাশী। 'চিৎ' স্বরূপ মানে চৈতন্যস্বরূপ, স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞান স্বরূপ। আর 'আনন্দ'

লেখক—শাখা সম্পাদক, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন, জয়রামবাটী ও প্রাবন্ধিক।

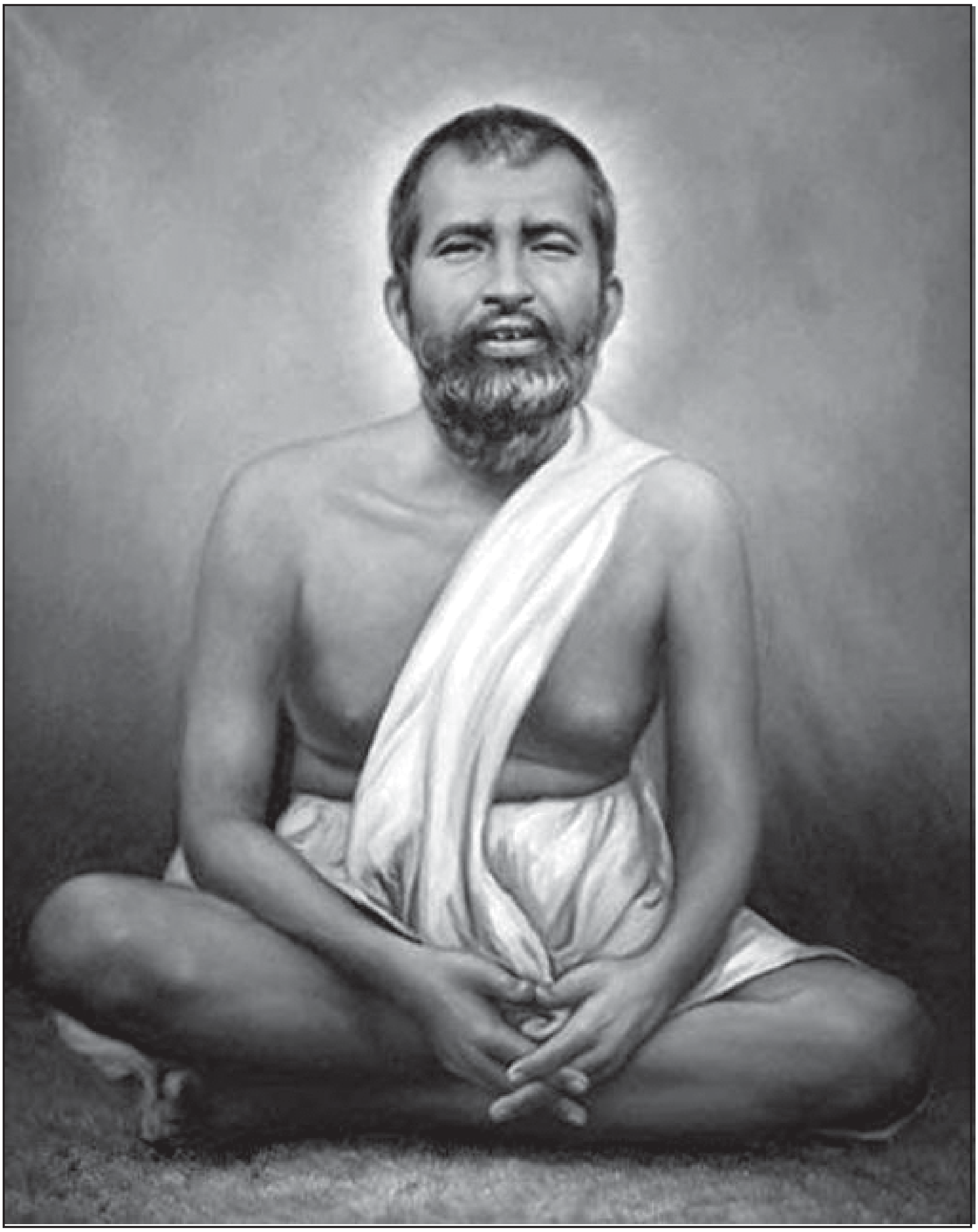

● যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ।

স্বরূপ মানে সুখ-দুঃখের পারে শাশ্বত আনন্দ সত্তা।

আমরা কেউই মরতে চাই না,কারণ আমাদের প্রকৃত সত্তা সৎস্বরূপ, অবিনাশী। আমরা সবাই জানতে চাই, আরও আরও জানতে চাই, আমরা প্রকাশিত হতে চাই। কেন চাই? কারণ আমরা চিৎস্বরূপ। এমন কেউ নেই যে নিরানন্দে থাকতে ভালবাসে। এমনকি কেউ যদি দুঃখ চায় তো সেটাও সে আনন্দের জন্যেই চায়। আমরা এরকম চাই কারণ আমরা আনন্দস্বরূপ। সুতরাং সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই আমাদের আসল স্বরূপ।

ঘড়িতে দম দিলে ছড়ানো স্প্রিং গুটিয়ে যায়। তারপর আস্তে আস্তে স্প্রিংটা খুলতে খুলতে আবার ছড়ানো অবস্থায় ফিরে আসে, কারণ ছড়ানো অবস্থাটাই স্প্রিং-এর স্বাভাবিক অবস্থা। একটা মাছকে পুকুরপাড়ে তুলে রাখলে মাছটা আবার লাফিয়ে লাফিয়ে পুকুরের জলে ফিরে যেতে চায়, কারণ পুকুরের জলই মাছের স্বধাম। সবকিছুর মতো মানুষও তার স্বাভাবিক অবস্থা তথা উৎসে ফিরে যেতে চায়। মানুষের এই স্বাভাবিক অবস্থা বা স্বরূপ বা উৎসই হল ব্রহ্ম বা সাধারণভাবে ঈশ্বর। উৎস থেকে বেরিয়ে উৎসে ফিরতে পারলেই আমাদের জীবনচক্র (life-cycle) সম্পূর্ণ হবে।

যখন দেশ-বিদেশের অনেক নামী-দামি তথাকথিত পণ্ডিতেরা মানবজীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্দেশ করতে হিমশিম খাচ্ছেন তখন প্রায় নিরক্ষর শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিঃসংশয়ে বারবার ঘোষণা করে গেছেন যে, ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।

অনেক হয়তো বলবেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আমরা শুনব কেন? একবার ঘোর নাস্তিক এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তর্ক করতে করতে শেষে বলেছিলেন, 'তবে হ্যাঁ, ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে ভাবি এমন মুখ কি কোনো সাধারণ মানুষের হয়! কত মানুষ দেখেছি, রাজনৈতিক নেতাসহ কত মানুষের ছবি দেখেছি কিন্তু এত সুন্দর দিব্যমুখ একটাও দেখিনি।' মনে রাখতে হবে, ঠাকুরের ছবি কিন্তু পূর্ব পূর্ব অবতারগণের ন্যায় কল্পনায় আঁকা নয়, একেবারে ক্যামেরায় তোলা। শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবিগুলিতে দেখা যায় আনন্দ যেন উপচে পড়ছে, যেন তিনি সব পেয়েছেন, পূর্ণতার এক অপার্থিব শ্রী তাঁর চোখেমুখে। স্বামীজি তাই লিখলেন, 'জ্ঞানাঞ্জন বিমল-নয়ন বীক্ষণে মোহ যায়।'

আনন্দস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানে থাকতেন সেখানেই 'আনন্দের হাট বাজার' বসে যেত। এমনকী দুরারোগ্য ক্যান্সারের দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও দেখা যেত তিনি আনন্দে ভাসছেন, আনন্দ বিকীর্ণ করছেন। অপরদিকে নিজেদের দিকে তাকালে কী দেখতে পাই? দেখতে পাই যার নেই সে তো হাহাকার করছেই, যার আছে তারও দুঃখের অন্ত নেই! এই দু'মিনিট হাসে তো পরক্ষণেই পাঁচ মিনিট কাঁদে। দুদিন হি হি তো পাঁচ দিন চিঁহি চিঁহি। তাই 'রামকৃষ্ণ শরণং'—ঠাকুরের কাছেই আমাদের জানতে হবে, শিখতে হবে আনন্দে বাঁচার কৌশল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কী করলেন? আমরা যে দিকে ছুটি সেদিকটায় প্রথম থেকেই একেবারেই গেলেন না। স্কুল-কলেজের ডিগ্রির জন্যে আমরা লালায়িত হই, অর্থ-রূপ-যৌবন-নাম-যশ-ক্ষমতার পিছনে জীবনভর ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ই। স্কুল-কলেজের ডিগ্রি ঠাকুরের ছিল না, কারণ 'চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যা' (অর্থকরী বিদ্যা) অর্জনে তাঁর আগ্রহ ছিল না। বই লেখা দূরে থাক, একটা প্রবন্ধও লেখেননি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে মনোরঞ্জনী গরম গরম বক্তৃতাও দেননি। মানুষের চিত্তহারী বিত্তকে ভৃত্য করে 'ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ' করে নৃত্য করেছেন। ক্ষমতার পিছনে দৌড়নো? বিষয়চিন্তারত রাসমণির গালে এই চড় মারেন তো তাঁর নামে জমিদারির একটা তালুক লিখে দিতে চাওয়ার অপরাধে অপরাধী স্নেহের মথুরকে ওই বাঁশ নিয়ে মারতে ছোটেন। নাম-যশের পিছনে ছোটা? আত্মভোলা ঠাকুরের সময় কই! ততক্ষণে 'ঝাঁটা মারি তোর লোকমান্যে' বলে পড়িমরি করে ছুটছেন 'জগদম্বার বালক', দিগম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গায় বান দেখতে, দেরি হলে বান চলে যাবে যে!

প্রশ্ন জাগে, কী করে তুমি পারলে ঠাকুর আমাদের এত সাধের প্রাণপণে চাওয়া বিষয়গুলোকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে? উত্তর মেলে যখন শুনি ঠাকুর রামলালকে বলছেন, 'ওরে রামলাল, যদি জানতুম জগৎটা সত্য তাহলে কামারপুকুরটাকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিতুম।' এখানেই আমরা ফেঁসে গেছি। আমরা সব এত বুদ্ধিমান যে, যা সত্য নয় সেটাকে সত্য বলে আঁকড়ে ধরে আছি, আর যা সত্য সেটাকে মিথ্যা বলে ধরে নিয়েছি! ইমেজ (image) ছেড়ে ছুটে চলেছি মিরেজের (mirage) পিছনে। ফলে 'আলেয়ার সাথে ছুটিতে ছুটিতে শ্রমজ-সলিল-সিক্ত-কায়।' শান্তি উদাও, আনন্দের দেখা নেই।

তাই ঠাকুর তাঁর জীবনে দেখালেন কেমন করে ফক্কাবাজির সংসারে ছক্কা হাঁকিয়ে থাকা যায়, দুঃখ-জ্বালাকে তুড়ি মেরে তুরীয়ানন্দে থাকা যায়। বললেন : "আমি ছাঁচ করে করে গেলুম, তোরা নিজেদের সেই ছাঁচে ঢেলে নে।"

তাই যদি লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়, তবে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকে লক্ষ্য করে এগোতে হবে। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ছাঁচে' নিজেদের ঢালতে হবে। ঢালতে পারলে কী হবে? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

গার্হস্থ্য জীবনে আধ্যাত্মিকতা

ড. গোপালচন্দ্র ভড়

মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ তাঁর গানের মাধ্যমে সংসারে ধর্মাচরণের প্রতিফলন দেখিয়েছেন :

'মনরে কৃষি কাজ জান না
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।'

আবার অন্য এক গানে :

'শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান
ওরে নগরে ফির মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে
শোন যত কর্ণপটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে।'

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধক্ষেত্রে বিমূঢ় সখা অর্জুনকে উপদেশ : সংসার কর্মক্ষেত্রে তুমি যা করো, যা আহার করো, যা হোম করো, যা দান করো বা তপস্যা করো তা সবই ভগবানকে অর্পণ মনে করে যাও—

'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব মদর্পণম্।' ৯.২৭

আবার অন্যত্র বলছেন, মানুষ নিজের স্বাভাবিক কর্মের দ্বারাই পরমেশ্বরকে অর্চনা করে পরম সিদ্ধিলাভ করে থাকে—

'স্বকর্মণা তমর্ভ্যচ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব।' ১৮.৪৬

স্বামী বিবেকানন্দ লন্ডনে তাঁর ব্যবহারিক বেদান্ত বক্তৃতায় উপস্থাপন করেন কিভাবে ব্যবহারিক জগতে কর্মকে স্বীকার করার মধ্য দিয়ে বেদান্তের ভাবধারাকে জীবনে প্রয়োগ করা যায়। তিনি গৃহস্থ জীবনে স্বাভাবিক কর্মের মাধ্যমেই ঈশ্বরের উপাসনার সওয়াল করেছেন। অন্যত্র এক বক্তব্যে বলেছেন : সংসারীরা ভগবানকে তার কর্মফলের উপায় হিসাবে দেখে থাকে সাধারণত, কিন্তু তা না করে যদি তার নিজ নিজ কর্মের মাধ্যমেই ভগবানলাভের উদ্দেশ্যসাধন করে যেতে পারে তবে সমগ্র জীবনটাই হয়ে ওঠে পূজা বা উপাসনা। এই ধারণাটি প্রাচীন এক খ্রিস্টান সাধু লরেন্সের জীবনধারার সঙ্গে মিলে যায়। তিনি বলেন, শ্রীভগবানের সান্নিধ্যলাভের জন্য সব সময়েই যে গির্জায় যেতে হবে এমন নয় ... অন্য সময় নিজ কাজের দ্বারাই সেইভাবে তাঁর সাথে যুক্ত থাকাই আমাদের কর্তব্য। কাশীপুর উদ্যানবাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে শেখান 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। তিনি আরও শেখান 'যার হেথা নেই তার সেথাও নেই' অর্থাৎ পরজন্মের গুণাবলী মানুষকে এ জন্মেই অর্জন করতে হয়। তিনি শিষ্যদের 'মুক্তি ও তাহার সাধন' বইটি পড়তে নির্দেশ দিতেন। সেখানেও পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে 'প্রত্যেক কর্তব্যপরায়ণ সাধকের পক্ষে সংসারের প্রত্যেক কার্য ঈশ্বরের কার্য, তিনি আহার করেন ঈশ্বরের জন্য—তিনি উপাসনা ও কর্তব্যসাধন সমভাবে রক্ষা করবেন।'

বর্তমান প্রবন্ধ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা উপার্জিত বেদান্ত তত্ত্ব, বিবেকানন্দের ব্যবহারিক প্রয়োগের ব্যাখ্যা এবং শ্রীমা সারদাদেবীর সাংসারিক জীবনে বাস্তব প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোকপাতের বিনম্র প্রয়াস। বেদান্তের কার্যকরী কিছু তথ্য (বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গিতে) :

ধর্মের অর্থ যা আমাদের ধারণ করে রয়েছে। শুধু মানুষ কেন, যে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব তার গুণ ধর্মের জন্যই, না থাকলে তার অস্তিত্বই মূল্যহীন হয়ে পড়ে বলেছেন মৌর্য সম্রাটের সভাকবি চাণক্য :

'স জীবতি গুণ যস্য ধর্মো যস্য স জীবতি
গুণধর্ম বিহীনস্য জীবনম্ নিষ্প্রয়োজনম্।'

এই ধর্ম ভারতবাসীর মজ্জাগত, আত্মপ্রকাশের বিজ্ঞান স্বামীজির

লেখক—বেলুড়ে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্মানিক অধ্যাপক। কর্মজীবনে তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন।

● ঋষি জীবনধারা।

মতে। তিনি আরও বলেছেন ধর্ম যদি মানুষকে সাহচর্য দিতে না পারে যতই নীতিমূলক হোক না কেন মানুষের কোনো কাজে আসে না। ধর্মের কাজ সাত্ত্বিক গুণাবলী অর্জনে জীবনকে উন্নীত করা, তা করতে হয় কর্মের মাধ্যমেই। কর্ম ও উপাসনা আলাদা নয়, কর্মই হয়ে যায় উপাসনা যদি শুভ মানসিকতায় সম্পন্ন করা হয়। এভাবেই মানুষেও দেবত্বে উন্নীত হতে পারে। বেদের ধর্ম প্রবৃত্তিমার্গ (ধর্ম, অর্থ ও কাম) ও নিবৃত্তি মার্গ (মোক্ষ)। বেদান্ত মতে মুক্তি বা মোক্ষ অর্জন করতে হয় না আমরা বাস্তবিক মুক্তই অজ্ঞানে ডুবে রয়েছি। কর্মের ক্রমবর্ধমান আসক্তিতে আটকে পড়েছি নিজে নিজেই গুটিপোকার মতো। অথচ মানুষের কোনো বন্ধনই ছিল না কিন্তু কর্মের ওইসব আসক্তিকে আটকে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছি। কর্মক্ষেত্রই কিন্তু মানুষের আত্মোন্নতির সোপান : দক্ষতা, ধৈর্য, দূরদর্শিতা মায় আত্মম্ভরিতাও ধরা পড়ে যায় কর্মে। যারা ঘোর বিষয়ী তারা পশুর মতো ইন্দ্রিয়ভোগে বদ্ধ হয়ে যায়। যাদের বুদ্ধিশুদ্ধি রয়েছে তারা শিল্প, সাহিত্য বা বিজ্ঞান উপভোগের আনন্দেই থেমে যায়। অন্তর্জগতে ঢোকা হয়ে ওঠে না। কিন্তু বুদ্ধি দুর্বল যন্ত্র কেননা একে ইন্দ্রিয়সমূহের সীমাবদ্ধতায় কাজ করতে হয়, সাফল্যের উচ্চতম শিখরে নিয়ে যেতে পারে না। হৃদয়ের প্রেরণাই মানুষকে মহান করতে পারে, বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাই এর পরের ধাপ হল যারা হৃদয়ের প্রেরণায় কর্মে নিঃস্বার্থপরতায় আমি-আমার বোধ ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। সবার সঙ্গে একাত্মতায় যেখানে আমার-তোমার বোধ থাকে না 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' শাস্ত্রের কথায়। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে এই অবস্থায় অহংবোধের বিলুপ্তি অর্থাৎ 'কাঁচা আমি'র পরিধি ছাড়িয়ে 'পাকা আমি'তে রূপান্তর। মাতৃভক্ত সাধক রামপ্রসাদ তাই গাইতেন—"করলি নে মা আমায় খালি, আর পারি না ভার বইতে।" বেদান্তের এই আদর্শ একাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হলে সমগ্র পৃথিবীটাই হয়ে যায় আমার আত্মীয় "বসুধৈব কুটুম্বকম্।" বেদান্ত আরও বলে, সর্বভূতে সমদর্শনই মুক্তির লক্ষণ।

ঈশাবাস্য উপনিষদে রয়েছে—সমগ্র জগৎটাই ঈশ্বরে ঢাকা, পার্থক্য শুধু মাত্রায় এবং নাম ও রূপে, প্রকারভেদে নয়। বিবেকানন্দের কথায়, "Everything is that ones, the difference is in degree, not in kind." উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, ধনী-দরিদ্রে পার্থক্য সম্পদের মাত্রায়, পণ্ডিত ও মূর্খের পার্থক্য জ্ঞানের মাত্রায়, সুখ-দুঃখের পার্থক্য আনন্দের মাত্রায়। আবার জগৎ নাম ও রূপের খেলা। মাটির প্রতিমার

বিভিন্নতা মাটিই থেকে যায়, সোনার বিভিন্ন গহনা কিন্তু সোনার পরিবর্তন হয় না, সেরকম ছানারই বিভিন্ন মিষ্টান্ন ইত্যাদি। আবার জগৎকে আপাত দ্বন্দ্বময় ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ দেখালেও অথচ কোনোটিও নিত্য নয়, বেদান্তের দৃষ্টিতে এটা মানুষেরই mental setp-up-এর বিভিন্ন মানসিক অবস্থা। কোনো পরিস্থিতিতে প্রলুব্ধ না-হয়ে নির্লিপ্ততা বজায় চেষ্টা করা (গীতা ২-৭২)।

জগৎ তার নিজ গতিতেই চলতে থাকবে, বিজ্ঞানের ভাষায় কার্যকারণ নিয়মে এ জগতের পরিবর্তন করার চেষ্টা বৃথা, কুকুরের লেজ সোজা করার মতো। আধ্যাত্মিকতা হল মনের এলাকা ছাড়িয়ে যাওয়া, (অগ্রে বর্ণিত তৃতীয় ধাপের ব্যক্তিরা), পাণ্ডিত্যে নয়। যত এগোতে থাকবে মনের শক্তি পিছিয়ে পড়ে। বেদান্ত বলছে, “যতঃ বাচো নির্বন্ততে অপ্রাপ্য মনসা সহ”। সতর্ক থাকতে হবে মনকে যেন ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ না করে। এ জন্য প্রয়োজন কৃচ্ছ্রসাধন। “Demands and apetite of the body have to be denied not fulfilled” রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন প্রথম শ্রেণির এক সাধুর ভাষায়, ফুলকে পাপড়ি খসাতেই হয় তবে ফল ধরে, ফলকে ঝরিয়া পড়িতেই হয় তবে গাছ হয়।

জগতে মানুষের প্রবণতা হয় দুই ধরনের স্বামীজির অনুসন্ধানে—কেউ পরিবর্তনশীল বাস্তব জগৎকেই আদর্শ লক্ষ্য করে জীবনযাত্রা শুরু করে থাকে, অন্যেরা শাস্ত্রনির্দেশিত আদর্শকেই ধরে থাকে। আদর্শের শক্তি অকল্পনীয়। একবিন্দু জলকণা পাথরের মধ্যে ঢুকে বরফ হয়ে পাথরটিকে বিদীর্ণ করতে পারে। প্রকৃত আদর্শ জীবনকে সঠিক পরিচালনা করে উচ্চতম পর্যায়ে নিয়ে যায়। প্রথম পর্যায়ের মানুষেরা নিজের দুর্বলতায় জীবনের সঙ্গে আদর্শের সমঝোতা করে ফেলে বারবার পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। বেদান্ত শেখায় প্রকৃতির পাঠশালায় জোগান অফুরন্ত, ক্রমাগত সংগ্রামের মাধ্যমে, যাতে ভিতরের সুপ্ত শক্তি বের হয়ে আসে জীবনকে সর্বোচ্চ আদর্শে উত্তরণ করে। আমরা যাকে মন্দ দুর্ভাগ্য বলে থাকি সেটা আমাদের অজ্ঞানতা এজন্য কাউকে কোনো দোষারোপ নয়। কাহারও সাহায্যের প্রত্যাশী নয়। বেদান্ত বলে সাহায্য আসে অন্তরাত্মা হতে। মানুষের প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী বিবেকানন্দ শঙ্করাচার্যের বেদান্তে ব্যবহারিক রূপ দিয়েছেন। চিরাচরিত বেদান্তে গৃহস্থ জীবন হতে ধর্মজীবন পৃথক করা হয়েছে। বুদ্ধদেব জীবনের এ পথে নৈতিকতায় জোর দিয়েছিলেন। শঙ্করাচার্য ধর্মজীবন গৃহ হতে দূরে বনে-পর্বতে-গুহাতে পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি হতে সরে এসে বেদান্তের তত্ত্বগুলিকে কীভাবে ব্যবহারিক কর্মজীবনে প্রয়োগ করা যায় তার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্জুনও যুদ্ধক্ষেত্রে তত্ত্ব শোনবার ও কার্যে পরিণত করবার প্রেরণা ও উন্মাদনা উভয়ই পেলেন আর সেটি না হলে তত্ত্বের কোনো উপযোগিতাই থাকে না। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ‘শিবজ্ঞানে জীবসেবা’ শুনে বনের বেদান্তকে গৃহস্থ জীবনে প্রত্যাবর্তনে দৃঢ়সংকল্প করেন যাতে দৈনন্দিন কর্মের মাধ্যমেই মানুষের কল্যাণে ব্রতী হওয়া যায়। যথা, ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন দেওয়া, তাদের অসুখের সময় সেবায় আত্মনিয়োগ করা, আবার তাদের অর্থকরী কর্ম-প্রযুক্তি বিদ্যা শিখিয়ে নিজ নিজ পায়ে দাঁড়ানোর শিক্ষা দেওয়া এবং সর্বোপরি সর্বশেষে সর্বোচ্চ সেবা হল অধ্যাত্মচেতনা জাগ্রত করা। এভাবেই জগতের কল্যাণ মাধ্যমে নিজ নিজ স্বার্থপরতা হতে মুক্ত হওয়া এবং নিজ মুক্তির পথ প্রশস্ত করে নেওয়া। এই আদর্শেই রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের কর্মযজ্ঞে অনুপ্রাণিত করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীকে (emblem) এ কথাই লেখা রয়েছে ‘আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।’ জগতের হিতসাধনের মাধ্যমেই নিজের মুক্তি। শুধু কর্মের সময়েই নয়, শাস্ত্রের নির্দেশ বেদান্ত আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইতে হলে যতক্ষণ শরীরে প্রাণবায়ু প্রবাহ চলতে থাকবে ততক্ষণ সর্বদাই বেদান্ত চিন্তা করে যেতে হয়! ‘আসুপ্তে অমৃতে কালং লয়েৎ বেদান্ত চিন্তয়া।’ যদি কেহ আন্তরিকভাবে বেদান্ত অনুসরণ করে থাকে নিম্ন চিন্তার কথাবার্তা তার কাছে অসহ্য ঠেকবে, স্বামীজির কথায়—“বেদান্তের সিংহগর্জনে শৃগাল গর্তে লুকাবে।” অন্যথায় যদি এইটি স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়, মন তার নিম্নগতি (শ্রীমা বলতেন, মনের স্বভাবই নিম্নগতি) নিজেই রাস্তা তৈরি করে নেয়, জল যেমন কারও কোনো প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই মাধ্যাকর্ষণের শক্তিতে নিম্নগামী হয়ে থাকে। এর ফলে মানুষ তার পূর্বজন্মকৃত অভ্যাসের বশে স্বাভাবিকভাবেই (গীতা ৩.৩৩) যেখানে তার বাসনা ও প্রবৃত্তি রয়েছে খুঁজে সেখানেই যাবে, আদর্শে উত্তরণ অধরাই থেকে যাবে দুর্লভ মানবজন্ম পেয়েও!

বেদান্তের আদর্শের তত্ত্ব বিভিন্ন উপনিষদ প্রান্তে আলোচিত। এর সারবত্তা চারটি মহাবাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে :

১. প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম (চেতনাই ব্রহ্ম) — আত্রেয়ী উপনিষদ (ঋক বেদ)

২. অহম্ ব্রহ্মাস্মি (আমিই ব্রহ্ম) — মাণ্ডুক্য উপনিষদ (যজুর্বেদ)

৩. তৎ ত্বম অসি (তুমিই সেই) — ছান্দোগ্য উপনিষদ (সামবেদ)

৪. অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম (এই আত্মাই ব্রহ্ম) — বৃহদারণ্যক উপনিষদ (অথর্ব বেদ)।

ব্রহ্ম কথাটির অর্থ ব্যাপকতম। সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ অর্থাৎ সদা সর্বত্র বিরাজমান, চৈতন্য এবং আনন্দময়। ব্রহ্ম হল শুদ্ধচৈতন্য ও ভেদরহিত, কোনো গুণ ও সীমাবদ্ধতার বাইরে। কোনো গুণের দ্বারা গুণান্বিত করিলে বা বিশেষের দ্বারা বিশেষিত হইলে তাঁকে সীমিত করা হয়। আমাদের আত্মা ও ব্রহ্ম অভেদ। আমাদের প্রকৃত সত্তা ব্রহ্ম হতে পৃথক নয়। কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব নিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু আত্মা চিরন্তন ও অসীম অর্থাৎ স্থান ও কালের সীমাবদ্ধতার বাইরে। কিন্তু জীবাত্মা কেবল অজ্ঞানে আবৃত। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান দূরীভূত হইলে জীব তার ব্রহ্মস্বরূপতা উপলব্ধি করে অথচ সংসার-দশায় মায়া বা অবিদ্যার প্রভাবে আবৃত থাকে, ব্রহ্মস্বরূপতা উপলব্ধি হয়ে ওঠে না। বিশ্বব্যাপী অজর অমর আত্মাকে দেহের পরিধির মধ্যে আবদ্ধ মনে করে আমরা নিজেকে সুখী করবার জন্য ধাবিত হই। এই সংকীর্ণতা বোধই আমাদের দুর্বল করে নানা সংঘাত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে চলে। অথচ আমাদের চার অবস্থায় জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তূরীয় ওই একই চৈতন্য বিদ্যমান।

আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে জড়জগতে সতত নামরূপ পরিবর্তন হলেও শক্তি সংরক্ষিত হয়। Law of conservation of Energy : শক্তি সংরক্ষণ নীতি। জড়জগৎ শক্তির অক্ষয়তা মেনে চলে, হয় শুধু বাহ্যিক পরিবর্তন। যথা, তাপ হতে আলোকশক্তি বা গতিশক্তি বা বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয় কিন্তু শক্তির সামগ্রিক যোগফল sum-total একই থাকে। আর প্রাণীজগতে যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে বাহির হতে শক্তি সংগ্রহ করে শরীরে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখে।

দৈনন্দিন জীবনে ধর্ম সমন্বয়ে শ্রীমা :

ধর্মের উচ্চ আদর্শের বাণী আমাদের উদ্বুদ্ধ করে থাকে নিঃসন্দেহে কিন্তু কীভাবে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে জীবনকে মহিমামণ্ডিত করা যেতে পারে তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য, বিশেষত সমস্যাসঙ্কুল আধুনিক জীবনধারায়। যদিও উপনিষদ নির্দেশিত প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গে দুইটি বিভিন্ন পথ : সংসারী ও মোক্ষকামী সন্ন্যাসীদের। শ্রীমা সারদাদেবী ধর্মজগতের উচ্চতম তত্ত্বগুলি দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন সংসারে থেকেও কীভাবে সংসারী না-হওয়া যায় যেহেতু তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী হিসাবে আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় : "নৌকা জলে ভেসে চলুক কিন্তু জল যেন নৌকায় না ঢোকে।" "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে সংসার করা।" আমরা কী দেখেছি এক অশিক্ষিতা গ্রামীণ কন্যা সরল ও বাধ্য যে আধ্যাত্মিকতার চরম সোপান দেখাল সংসারে সকল কাজ কন্যারূপে সম্পন্ন করা। দক্ষিণেশ্বরে স্ত্রীরূপে কর্তব্যপরায়ণ এবং পরে গুরুরূপে ও মারূপে অগণিত ভক্ত সন্তানকে জীবন দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন সাধারণের মতো জীবন কাটালেও সবকিছুই ছিল তাঁর অসাধারণ। তিনি আরও দেখিয়েছেন, সমাজে দুর্বলরা সহানুভূতি ও পথনির্দেশ পেলে, সময় ও সুযোগে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম। আর তরুণ সাধু-সন্ন্যাসীদেরও শিখিয়েছেন সর্বক্ষণ ধ্যানজপে না থেকে সমাজের কল্যাণে সেবাকাজে আত্মনিয়োগ। তথাকথিত স্কুল-কলেজে তিনি পড়াশোনা করেননি অথচ একাধারে ছিলেন আদর্শবাদী এবং প্রখর বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্না। তাঁর গভীর অন্তর্নিহিত দৃষ্টি ছিল। এর ফলে তাঁর সংসারের এবং উদীয়মান রামকৃষ্ণ মিশনের পত্তনের পর সব পরিস্থিতিকে সামলিয়ে ছিলেন অবিচল চিত্তে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে। নির্ভুল মীমাংসায় তিনি ঘটনার মর্মস্থলে প্রবেশ করে প্রশ্নকর্তার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারতেন।

বেদান্ত বলছে এ জগৎ অনিত্য এবং আত্মীয়-স্বজন সবই মায়া। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি একান্নবর্তী পরিবারে (যা তখনকার দিনে স্বাভাবিক ছিল) সদা দ্বন্দ্বকারী ভ্রাতৃগণ তাদের স্ত্রী, পাগলি মামি ও তার কন্যা রাধু, নলিনী, মাকুকে নিয়ে অভাবী সংসারে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে গেলেন কোথাও কোনো আসক্তিতে জড়িয়ে না পড়ে। তিনি বলতেন, যাদের ঘরে জন্ম নিয়েছ তাদের দেখতে হয়। তাই বাবা-মা-ভাই-ভাইপো-ভাইঝিদের জন্য করতে হয়। ঋণ কারও রাখতে নেই তাহলে বন্ধন দূর হবে না তা না হলে রাধি আমার কে? যে রাস্তায় তুমি চলেছ সে রাস্তায় যদি কেউ পথভ্রষ্ট হয় তাকে তুলে ধরতে হয়। কাউকে পথে পড়ে থাকা ফেলে যেতে নেই। শ্রীমা নিজের জীবন দিয়েই এই আদর্শ দেখিয়ে গেলেন। পথে পড়ে থাকা কত পাপী-তাপী আর্তকে দু'হাতে তুলে নিয়ে নিজের কোলে ঠাঁই দিয়েছেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে। তিনি দেখালেন কায়দা করে বা দায়িত্ব দিয়ে কাউকে দিয়ে কিছু করানো যায় না কিন্তু ভালবাসায় সব হয়। সংসারে থাকতে গেলে সবাইকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে হয় এমনকি জড়বস্তুকেও। যার কাছ হতে

কাজ নেওয়া হয় যেমন ঝাঁটা দিয়ে কাজে করবার পর সযত্নে সঠিক জায়গায় রেখে দেওয়া ইত্যাদি।

শ্রীমা সাধারণত নীতিবাক্যে উপদেশ দিতেন না যা বক্তব্য তাঁর ব্যবহার ও আচরণেই প্রকাশ হত। মানুষের পরীক্ষা হয় প্রতিকূল অবস্থায়। বেদান্তের ধর্ম আচরণে প্রকাশ। মানুষ কষ্ট পায় পূর্বজন্মকৃত কর্মফলে, তিনি বলতেন। তিনি আরও বলতেন, দুঃখ ভগবানের দয়ার দান। এইসব সংকট কালেই মানুষের সত্যকার পরীক্ষা হয়ে থাকে। চেষ্টা করতে করতেই ভিতরের সুপ্ত শক্তি জেগে ওঠে। তাই বলতেন, ধৈর্য ধরে ঈশ্বরের নাম করে যাও। ফুল যেমন নাড়াচাড়া করতে করতে, চন্দন কাঠ পাথরে ঘসতে ঘসতে যেমন গন্ধ বার হয়, আধ্যাত্মিক জাগরণ ভগবানের চিন্তা করতে করতে আসে। তাঁর সেবক সরলাদেবীকে (পরে সারদা মঠের অধ্যক্ষা?) বলেছিলেন, 'মানুষ নিজের মন খতাতে চায় না, কেবল অপরের দোষ দেখে। নিজের দোষগুলি যদি চোখে পড়ে আর সেগুলো যাতে চলে যায় তার জন্য যদি চেষ্টা করে, তাহলে অপরের দোষ দেখার প্রবৃত্তি থাকে না। মানুষের এই স্বভাব মহামায়া সৃষ্টি করে রেখেছেন, নিজের তিলপ্রমাণ গুণটা ভাল করে দেখা। নিজের মহত্ত্ব নিয়েই মশগুল, অপরের কথা ভাববে কী? নিজের উন্নতির চেষ্টা না থাকলেই অপরের ভালমন্দ নিয়ে নিজের মনকে কেবল অযথা উত্তেজিত করবেই। ভুল মানুষ করেই থাকে কিন্তু অপরের দোষ খুঁজে বেরিও না, তাহলে তোমার মনও দোষী হয়ে যাবে।'

বয়স্ক ও শোকার্তা এক মহিলাকে সান্ত্বনাছলে বলেছিলেন, যদি শান্তি চাও জগতকে নিজের বলে ভাবতে শেখ, কেউ পর নয় জগত তোমারই। এটাই বেদান্তের মূল কথা। আবার বেদান্তের এই একাত্মতার কথাই শিখিয়েছিলেন এক ছোট্ট শিশুকে বিদায় দেবার সময় এই বলে যে জগতে সবাইকে যেন সমানভাবে ভালবাসে, কম বেশি নয়, না-হলে তার সমানত্ব অটুট থাকবে না। ভালবাসায় মনের প্রসারণ হয় এজন্যই মনের শুদ্ধিকরণে বেদান্তে জোর দেওয়া হয়ে থাকে। আবার গৃহীদের গার্হস্থ্য ধর্ম শেখাবার জন্য ঘরে 'কাঙালিনী সেজে ঘর নিকোচ্ছেন, বাসন মাজছেন, চাল ঝাড়ছেন, এমনকি ভক্ত ছেলেদের এঁটো পর্যন্ত পরিষ্কার করছেন—এসব তাঁর অসীম ধৈর্য, অপরিসীম করুণা সর্বোপরি সম্পূর্ণ অভিমানাহিত্য'—স্বামীজির এক চিঠি হতে। শুধু তাই নয়, কলকাতার ভক্তদের জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে তাদের পছন্দের খাবার সংগ্রহ করে আনতেন। শ্রীমা এইরকম পাত্র বেছে বেছে সঠিক সময়ে সঠিক উপদেশ তাঁর ব্যবহারে দিয়ে গেছেন যাতে তারা আত্মস্থ (assimilate) করতে সক্ষম হয়। এটা তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হতেই শিখেছিলেন। তিনি শ্রীমাকে আরও শিখিয়েছিলেন, সবাইকে একই উপদেশ নয় যার পক্ষে যেটা উপযোগী সহজে হজম হয় : যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। ঠাকুর নিজেও গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যদের আলাদা আলাদা উপদেশ দিতেন। আবার সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যেও নরেনকে আলাদাভাবে মূল অদ্বৈত বেদান্তের বই অষ্টাবক্র সংহিতা পড়তে নির্দেশ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য ছিল ভাবসমাধি হত, অথচ শ্রীমার ভাব সবসময় অন্তর্মুখী। ঠাকুরের বাছবিচার ছিল কত বাজিয়ে বাছাই করে শিষ্য নিতেন। অথচ শ্রীমা সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন, সকলের দ্রব্য খাচ্ছেন সব হজম হয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, শ্রীমা যখন প্রথম কামারপুকুর হতে দক্ষিণেশ্বরে এলেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমা বলেন, 'তোমাকে তোমার ইষ্টপথে সাহায্যের জন্যই এসেছি।' এটি শুধু ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই নয়, চলে যাবার পরেও সুদীর্ঘ তিন দশক ধরে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তাঁর জীবৎকালে আধ্যাত্মিক ভাবনা এগারো জন সাক্ষাৎ শিষ্য ও কতিপয় গৃহী-শিষ্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। শ্রীমা এর বহুগুণ বাড়িয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত আদর্শে রামকৃষ্ণ মিশন পত্তনে শ্রীমা'র অবদান ছিল অনির্বচনীয়। এ সম্পর্কে সাধু-সন্ন্যাসীদের কার্যকারী অনেক নীতিগত সমস্যারও সমাধান করে দেন।

উপসংহার :

চেষ্টা ছাড়া জাগতিক জীবনে যেমন কিছু অর্জন করা যায় না আধ্যাত্মিক জীবনেও প্রয়োজন যথাযোগ্য প্রস্তুতি। উপরন্তু বোধশক্তির উন্মেষ না হলে অর্জিত বস্তুর যথোপযুক্ত ব্যবহারও করা যায় না। এজন্যই বেদান্ত শেখায় সৎ ও নীতিপরায়ণতা। শ্রীমা'র বাণী—সহ্যের সমান গুণ নেই সন্তোষের সমান ধন নাই। বিবেকচূড়ামণিতে (শঙ্করাচার্য) রয়েছে তিতিক্ষা :

"সহনাং সর্বদুঃখানাং চিন্তাবিলাপরহিতং অপ্রতিকার পূর্বকম্।"

সব দুঃখ সহ্য করে যাও, চিন্তা ও বিলাপ না করে এবং প্রতিকার প্রবৃত্তিও যেন না হয়। এইভাবে মন শুদ্ধ ও পবিত্র করে দৈনন্দিন কর্মে নিয়োজিত করা যাতে কর্মটি হয়ে পড়ে একপ্রকার সাধনা। শেষে কর্মটি হয়ে যায় উপাসনা—কতখানি

আমি নিজেকে উৎসর্গ করতে পারলাম। এই উৎসর্গ ভাবনার মধ্যেই (ভাগ দেওয়া) ভক্তির জন্ম—বলেছেন বিগত শতাব্দীর পণ্ডিত আনন্দ কুমারস্বামী। ভারতের চিরন্তন আদর্শ—আগে নিজে জগতের পরিণামী বস্তুর অসারতা অনুভব করতে হয়। এটি পরের মুখে ঝাল খেয়ে হয় না। এইভাবেই পরিণামী বস্তুর প্রতি ত্যাগের (আত্মসুখ বর্জন) উন্মেষ হয়। স্বামীজি তাঁর কর্মযোগ বক্তৃতায় বলেছেন, জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ, সুখলাভ নয় কেননা প্রকৃত আনন্দ জাগতিক বস্তু সংগ্রহে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় অন্তরে বেদান্ত মতে। তাই বেদান্ত বলে, আধ্যাত্মিকতা হল ওই অজ্ঞানতা হতে জ্ঞানে প্রত্যাবর্তন। সেজন্য বিবেকানন্দ আরও বলেছেন, One must pass through Karma and Bhakti before Jyan দেববাণীতে। জ্ঞানলাভের জন্য কর্ম ও ভক্তির ধাপ আগে অর্জন বাঞ্ছনীয়। কর্ম না করলে জ্ঞান পরিপুষ্ট হয় না। আবার ভক্তি ব্যতিরেকে কখনো জ্ঞান সম্ভব নয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি। তিনি ভিতরে ছিলেন তুখোড় জ্ঞানী যা কথামৃতের প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্ভাসিত। জগৎকে যাঁরা সাধনার উপায় হিসাবে দেখে জীবনযাপন করে থাকে তারাই হন প্রকৃত অধ্যাত্মবাদী। তবে জীবনে উত্তরণ দ্বন্দ্ব/উভয় সংকটে না পড়লে হয় না, হয় দৃঢ়ভাবে নিম্নপ্রবৃত্তি ত্যাগে উচ্চপ্রবৃত্তি গ্রহণে। এভাবেই নিজেকে তুলতে হয়। "All growth is through conflict you subdue your lower nature and develop higher nature." —Swami Asokananda

যদি মনোবৃত্তি পবিত্র এবং পক্ষপাতবিহীন হয়ে থাকে প্রকৃতিই সব ব্যবস্থা করে দেয়। কারণ প্রকৃতিই ভগবানের কার্যকারী রূপ (গীতা ১৫.১৬)। ঠাকুরের জীবনে এরকম বহু ঘটনা কথামৃতে বর্ণিত। চূড়ান্ত উদাহরণ পঞ্চবটীতে তাঁর সাধনার সময় গৃহপালিত পশুরা উপদ্রব করত, দেখা গেল জোয়ারের জলে বাঁশ দড়ি ইত্যাদি বেড়া দেওয়ার সামগ্রী ভেসে এল স্থানটিতে নিরুপদ্রব সাধনার স্থান সংরক্ষিত করার জন্য।

মানুষই বস্তুতান্ত্রিক এই জগতকে চিরকাল শাসন করে এসেছে। তাই মানুষের মনোবৃত্তি যদি সৎ ও নীতিপরায়ণ হয় সমগ্র জগতটাকেই সে ভাল দেখবে কেননা প্রকৃতির রাজ্যে সর্বত্র সমন্বয় বিদমান, বৈষম্যের ঠাঁই নেই বিজ্ঞানও এই কথা বলে Law of Equilibrium-এ। বহুল প্রচলিত প্রাসঙ্গিক প্রবাদে বাক্য—"আপ ভাল তো জগত ভালো।" অধিকন্তু ভাল করবার থেকে ভাল হওয়াটাই উত্তম বিবেচিত যেটি তার চারিত্রিক সম্পদ, বাহ্যিক সম্পদ নয়। ভাল করবার পিছনে সাধারণত স্বার্থ থেকে যায় যা অসৎ উদ্দেশ্যে সংগঠিত হতে পারে। কিন্তু ভাল হওয়াটা মজ্জাগত যা তার বিভিন্ন ব্যবহার ও আচরণে প্রকাশ হয়ে থাকে যেটি শুধু কিছু দান করবার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করে : যেমন সহানুভূতি দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, সমাদর করেও। এছাড়াও সম্মান দেওয়া, উৎসাহ দেওয়া, সান্নিধ্য দেওয়া রয়েছেই। এসব আমরা শ্রীমার ব্যবহার হতে শিক্ষা পাই। স্বামীজি তাঁর জ্ঞানযোগ বক্তৃতায় বলেছেন, 'আমি কোথায়ও খারাপ দেখি না যদি না খারাপ আমার ভিতরে থাকে।' তাই আমি নিজে subjective চারিত্রিক যদি পরিবর্তিত হই ওই শুদ্ধ ও পবিত্রতায় তবে আমার দৃষ্টিভঙ্গি জগৎ সম্বন্ধে পরিবর্তিত হতে বাধ্য। আমার কাছে জগতের কোনো দ্বন্দ্ব বোধই হতে পারে না। এটিই বেদান্তের মুক্ত অবস্থা (Freedom)।

আপ ভালর মতো আর একটি বহুল প্রচারিত বাক্য "যদ্দিন বাঁচি তদ্দিন শিখি" ঠাকুরের এইরকম আরও দুই-একটি কথা আমাদের মতো বয়স্করা বাল্যকালে ঠাকুরমা-দিদিমার কাছে শুনতাম। তারা পৌত্রদের নীতিকথায় উদ্বুদ্ধ করতেন। ম্যাকস্‌মুলার তাঁর বিখ্যাত বই 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও শিক্ষায়' এটাই উপস্থাপন করেছেন, হিন্দুধর্মের প্রাচীন ঐতিহ্য শ্রীরামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীতে।

আধুনিক জগৎ মানুষকে (hypnotise) মোহমুগ্ধ করে বদ্ধ করেছে। জন্মের পর শেখানো হয়েছে তুমি ছোট, অজ্ঞানী নির্বোধ ও সীমিত কিন্তু বেদান্ত শেখায় তুমি সীমিত নও—স্বামীজির ভাষায়। বেদান্তের কাজ মানুষকে (de-hypnotise) মোহবদ্ধ হতে মুক্ত করা। অষ্টাবক্র সংহিতার ভাষায়—

মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধোভিমান্যপি।
কিংবদন্তি হি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ।।

মানুষ যা চিন্তা করে তাই হয়ে যায় প্রবাদ বাক্য। যে নিজেকে মুক্ত মনে করে সে মুক্তই আবার যে নিজেকে বন্ধন মনে করে সে বন্ধনেই থেকে যায়। সংহিতা আরও দৃঢ়ভাবে বলছে, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ মনেরই, তুমি কর্তা নও ভোক্তাও নও তুমি নিত্য মুক্ত। এভাবে ব্রহ্মচিন্তায় সবাই উপকৃত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'যদি সাংসারিক ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত কর, টাকা তোমার নিকট আসিবে। যদি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইতে ইচ্ছা কর তবে অদ্বৈতবাদকে সেইদিকে প্রয়োগ কর তুমি মহামনীষী হইবে। যদি মুক্তিলাভ করিতে চাও তবে অধ্যাত্মভূমিতে অদ্বৈতবাদ প্রয়োগ করিতে হইবে তবে তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে।'

তুমি আছো

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

বসিয়েই রেখেছিলে, বসেই তো আছি
তোমার পায়ের তলে। দুই পা দেখতে পাই কই?
কই পাই পায়ের পরশ?

আর কতকাল
বসেই ঘুমোব ওই পদযুগ পাশে?
আর কতকাল?

গোপনেই কাঁদি।
বুক বাঁধি, বুক ভেঙে যায়
কান্নার পাথর বুকে নিয়ে।

জানি, তুমি আছো,
জানি, তুমি মরমে গোপনে
আমাকে জাগিয়ে রাখছ এতকাল।
তবুও পাই না দেখা। এ কেমন হেঁয়ালি তোমার?

হঠাৎ ভাঙল ঘুম। দেখি কেউ নেই।
শুধু আমি ঘুমের ভেতরে জেগে আছি
আগেকার মতো।
তুমি আছো আমার ভেতরে।

পুনর্জন্ম

ভবেশ বসু

যদি চাই পুনর্জন্ম হবে
এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি—
মানুষের মতো দেখতে অর্ধেক মানুষ
অথবা দর্শকের হাততালি কুড়োতে, এক মুহূর্ত
লাগল না এক নারীর কাপড় কেড়ে নিতে
বা নিরীহ মধু সংগ্রহকারীর রক্ত মাংস গিলছি
পুরোপুরি বাঘের কায়দায়
সে সবই অভিনয়
সে সবই মঞ্চে খ্যাত হওয়া
ঘরে ফিরে বল, বারবার বল
তোমাদের সব খুশি ফেলে রেখে এলাম
কান্না নিয়ে বাড়ি ফিরেছি।
যদি চাই পুনর্জন্ম হবে।

সম্রাট তার জন্মের জন্য কুটিরে এসেছে
শিশু কোলে নিল
ভেজা মাটিতে বসল, পুণ্যতীর্থের মতো
প্রসাদ গ্রহণ করছে কলাপাতায়
সানাই-এর শব্দ তার ভাল লাগছে না।
শুনতে চাইছে বাঁশের বাঁশি
তুমি বাজাও উদাসী রাখাল বালকের মতো,
আর দেখতে থাক, সেরে যাচ্ছে তার মুখের কাঁটা, ব্রণ
স্বীকার কর আর না কর,
তখনই মাটিতে ফসলের কথা লেখা হচ্ছে!

জতুগৃহের উঠোনে দাঁড়িয়ে একবার চিহ্নিত হও
এ আগুন আমারই ছিল।

চরৈবেতি

স্বামী প্রভানন্দ

ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির লীলাবিলাসের অন্তরালে
সৃষ্টি বিকশিত হয় অনাদিকালের কলেবরে;
দেশ-কাল-নিমিত্তের মায়াবী আবরণে
চৈতসত্তা প্রকটিত জগতের মাঝে নাম-রূপে।।

ইতি-ইতি মহান তত্ত্বের সাবলীল প্রকাশ
জগৎকে করে আলোকিত আপন মহিমায়;
নেতি-নেতি নিগূঢ় তত্ত্বের নিবর্তনের গতিতে
জগৎ হয়ে যায় বিলীন উপাধিহীন ব্রহ্মতত্ত্বে।।

সাকার বিকার বহুরূপে ব্যাপ্তির সাগরে
তরঙ্গায়িত চৈতসত্তা কেবলি স্বপ্নের জাল বুনে;
নিজেকে বদ্ধ করে প্রকৃতির লীলাবৈচিত্রের অমোঘ আকর্ষণে
ইন্দ্রিয়বিলাসী মনের সাথে সুখের সখ্যতা গড়ে।।

বাসনার মন্থনে প্রতিভাত হয় সুখের সাম্রাজ্য
মনের মণিকোঠায় দাম্ভিক সম্রাটী কায়দায়;
একইভাবে জন্ম দেয় দুঃখ-বাসনার পরশ ছুঁয়ে
বেদনা-বন্ধুর বঙ্কিম পথে জীবনের ধারাতে।।

অমানিশার গাঢ় আঁধার পেরিয়ে আসে আলোর দ্যুতি
পূর্ণতার অভিসারে নতুন সাজে জীবনের নন্দন-কাননে;
প্রকটিত হয় চৈতসত্তার প্রজ্ঞানঘন রূপ
কামনা-বাসনা লিপ্ত স্বপ্নময় সাম্রাজ্যকে ছাড়িয়ে।।

দুটি টুকরো সংলাপ

শ্যামলকান্তি মজুমদার

এক

চেয়ে থাকতে থাকতে
ভুলে যাই জেগে আছি

বন্ধ করলেই চোখ
কোথাও হারিয়ে যাবার ভয়
রাতের নীরবতা বহন করতে করতে
কড়া নাড়ে ভোর

দুই

কাউকে তো বলতেই হবে
শুরু করবে কে প্রথম?

চোখ বলছে আমি নই
মুখ কিছু বলছে না

কেমন তুমি ভাবলেশহীন।

অপরূপ

জগন্ময় মজুমদার

অরূপের কাছ থেকে রূপ চেয়ে ফিরি
অপরূপ বসে আছে ঘরে
অপেক্ষা আমার-ই

কোনখানে কেন মিছিমিছি ঘোরো যাযাবর
বলে সে আমায় :
একবার চেয়ে দেখো নিজের ভিতর।

ভিতর দেখব বলে বাইরে দাঁড়াই
সবখানে দেখি তাকে
দৃশ্যে শুধু নাই।

নির্জনে পথ

সুনীল শর্মাচার্য

মাঠের শেষে আঁকাবাঁকা নদী
নদীর পাড়ে মুখ-আঁধারি বন;
বনের মাঝে রহস্যময় পথ—
কত কাঁটা, গল্পভরা ক্ষত!

পথ গিয়েছে ভালোবাসার কাছে
বনের ছায়া চোখেতে দর্শন,
দৃশ্য আছে ভাবনা যতক্ষণ
মনের কাছে আকুল ছায়া আছে ...

ক্ষণকালে আকাশে ওঠে চাঁদ,
চাঁদের আলো ছড়িয়ে পথে পথে,
পথ পেতেছে কত রকম ফাঁদ ...
নির্জনে পথ আরো গভীর পথে!

ভেজাল

অনিল সাহা

যে খাদ্যে প্রয়োজনীয় গুণ নেই, বল সত্য বল
ভেজাল দেওয়া খাওয়ার খেলে হবেই পেটের গণ্ডগোল।
যে খাদ্যে প্রয়োজনীয় উপাদান
বনস্পতি, মার্জারিনে মাখানো ঘি আর মাখন।
ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড চটজলদি খাবার
উচ্চ রক্তচাপ, ক্ষয়রোগ হতেও পারে আবার।
চাউমিন, নুডলস, বার্গার ও পিৎজা
স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি, বেশি খেলে নেবে রোগশয্যা।
ভ্যানিলা, ভ্যানিলা, ভ্যানিলার দেহে
সবচেয়ে প্রিয় গন্ধ ভ্যানিলা আইসক্রিম।
ভ্যানিলা গাছের ফল, সিম জাতীয় দানা,
শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর প্রাকৃতিক ভ্যানিলা।
আধুনিক ভ্যানিলার জন্ম কাগজকলের বর্জ্য পদার্থে
রাসায়নিক ভ্যানিলা আবিষ্কার আলকাতরা থেকে।
মিথাইল প্যারাথিয়ন স্প্রে হলে ফুলকপি সাদা ধবধবে
সবুজ সতেজ রাখতে ঢেঁড়স ডুবায় কপার সালফেটে।
জিলাপি, গোলাপজামে রং টানে আপনাকে
রং-বেরঙের ব্যবহারে কিডনি, চোখ নষ্ট হতে পারে।
পানমশলা, গুটখা, খৈনি তামাক জাতীয় খাদ্য
মুখ ও পাকস্থলিতে ক্যান্সার অতি অবশ্য।
মোনোসোডিয়াম গ্লুটামেট এমএসজি রাসায়নিক দ্রব্য
এই দ্রব্যটির ভাল নাম আজিনামোটো, বুঝলে সত্য!
এমএসজি ব্যবহার নয় শুধু ম্যাগিতে
সস, আচারে মিশায়ে তবু স্বাদ বাড়াতে।
রসে-বসে মুখে দিয়ে মিটাই রসনা সঙ্কট
শরীরে নিঃশব্দে ঢুকে বিস্তার করে রোগ কর্কট।
বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে কথাগুলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার
ভেজাল বেহাল খাদ্য কতটা নিরাপদ ভাবতে হবে সবার।

শুভ প্রাণ

অশোককুমার সাহা

পথের ধারে বসে একটি ক্লান্ত জীবন।
চোখের জলে দুই হাত মেলে তোমার দিকে,
ছোট্ট ভিক্ষার পাত্র হাতে।

পরশে ঢেলে শুভ আলোকশিখা এনে দাও।
এই আলোকশিখা সঞ্চারিত হোক,
প্রাণের ভেতরে, প্রাণে প্রাণে।

উন্মেষে চৈতন্যর দিক দীপ্ত হয়ে যাবে
আর ফলস্বরূপ তমসা ছিঁড়ে মনুষ্যকুল
ফিরে পাবে শুভ আলোকধারা।

মা-গো, শুভ প্রাণ ভরে দাও প্রাণে প্রাণে।

কলম

অরুণ দত্ত

...আত্মখণ্ডনে নয়
হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে
কবিতার নিবন্ধে জাগরিত হতে চাই ...।

সত্যের মহত্তমে প্রাণের যে বিকাশ
সেই অমোঘ বাণী থেকেই
জীবনের কথা বলতে চাই—।

আগামী দিন ফোটার ভাবনায় ঈশ্বর
তোমার বাগানে আঠালো অধিকারে
ঝকঝক সকালে স্ব-কাল হতে চাই ...।

সেই স্ব-কাল ...
যে সকালে ব্রহ্মজ্ঞানের সাথে
স্থিতধী হয়ে কলমে কলম হাঁটতে চাই ...।।

স্বর্ণমুদ্রা

অপূর্ব নায়েক

বরের জন্যে গোধূলির আকাশ আঁকছিলে তখন
দাঁতে কামড়ে ধরা তুলি বাঁ-হাতে রঙের ট্রে
ঘাড় বাঁকিয়ে দূর থেকে দেখছিলে বারবার
আমার ফোন বেজে বেজে নীরব হল

প্রেমিকের জন্যে সাজাচ্ছিলে রাতের আকাশ
ইজিতে কাচা ঝকঝকে চাঁদ দিগন্তে রাখা
নারকেল পাতা চুঁইয়ে আলো নামছে
জ্যোৎস্নাগন্ধে ঝিমলাগা চরাচর
তারার বুটি বসাচ্ছ নিবিড় ভালোবাসায়
আমার মেসেজ শাদা চাদরে ঢাকা সার সার শুয়ে

কী বিচিত্র পরীক্ষা আমার
অপেক্ষা আর আমি পাশাপাশি বসে
বুকের বাঁ-দিকে অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা রেখে

পঁচিশে বৈশাখ

গায়ত্রী সেন

বৈশাখের ভোরের সূর্য ছড়িয়ে দিল আলো
ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় সেই আলো চমকালো।
বেজে ওঠে ঘরে ঘরে জন্মদিনের শাঁখ
জুঁইফুলের পূজার অর্ঘ্য তাঁর বেদিতে থাক।
আনন্দেরই সুর শেখালে তোমার গানে গানে
একলা চলার অভয়বাণী শোনালে সব প্রাণে।
জীর্ণ যা কিছু ফেলে দিয়ে তাকে নূতনেরে দিলে ডাক
প্রণাম রাখি তোমার পায়ে আজ পঁচিশে বৈশাখ।।

লিমেরিক

নিখিলরঞ্জন চক্রবর্তী

এক.

কুকুরটা তার বুঝত ভাষা বাংলা এবং জাপানি
ইংরেজিটা অল্পস্বল্প, বলতো পেলে চা-পানি।
মালিক ছিল ওড়িয়া
পড়তে গেল কোরিয়া
হরেকরকম ভাষা শুনে হল তার হাঁপানি।।

দুই.

খবরটা মিথ্যে নয়কো সাচ্চা
সাবধানী লোক, হিসেব গণ্ডা কাচ্চা।
সাংবাদিকটি বলল হেসে
দেখল সবাই অবশেষে
সাপের হল সিজারিয়ান বাচ্চা।।

মা

শ্রাবণী সিংহ

বৃষ্টিস্নাত মেঠো পথ,
সোঁদা মাটির গন্ধ।
এগিয়ে চলেছে তৃষিত প্রাণ।
এক দুর্নিবার আকর্ষণে।
কেন এত টানে তাকে!
ঐ বাহুল্যবর্জিত দেবালয়ে কী আছে ?
শহুরে আধুনিকতা তো এখনও স্পর্শই করেনি।
কেমন একটা পেলবতা, মাধুর্য, অনিবার্যতা।
স্নিগ্ধা মা বিরাজমানা।
কী জীবন্ত,
একদৃষ্টে সবাইকে প্রত্যক্ষ করছেন।
মেঘের গর্জন, মৃদুমন্দ হাওয়া, বিদ্যুতের ঝলক,
কিছুই দমাতে পারছে না যে।
জলীয় ইশারায় কী যেন বলতে চায় ...
আমরা কি বুঝতে পারি!
মায়ের সাথে সহজালাপ,
সজল নয়নে ব্যাকুলতার প্রকাশ,
আর মায়ের অমোঘ উচ্চারণ..
'সবসময় জানবে তোমাদের একজন মা আছেন'
এই আশ্বাস বাণী পাথেয় করে ফেরা ...
পিছনে রয়ে গেলেন মা।
কিন্তু সামনে ও কে যায়?
ঘোমটা ঢাকা গ্রাম্যবধূটি যেন!
ঐ তো মা,
জগজ্জননী মা আমাদের।
অনুভবে, উপলব্ধির মরমি ব্যঞ্জনায়,
মা আছেন...
আশ্লেষে, দৈনন্দিনতায়, প্রেমে, মনুষ্যত্বের আহ্বানে,
বেঁচে থাকার সুদৃঢ় অঙ্গীকারে।
এক এবং একটিমাত্র শব্দ 'মা'....

উৎসব

শ্যামাপ্রসাদ কুমার

আকাশ-বাতাস-রৌদ্র-ছায়ায় উঠেছে মনকে টানার ঢেউ
পূজার আমেজ লাগাতে বোধহয় ডাকছে যেন-বা-কেউ।
পূজা-পূজা গন্ধ যেন বাতাস মাঝে ভাসে—
একটি বছর কাটলে তবেই পদ্ম-শালুক হাসে,
দিঘির জলে পাপড়ি মেলে ওরা খিলখিলিয়ে চায়
সময় যেন মাসটি ছেড়ে দিনের দিকে ধায়।
জলভরা মেঘ নিচ্ছে ছুটি কৃষ্ণসখার কাছে
নীল আকাশে ভাসাতে ভেলা সাদা বলাকার ধাঁচে।
তাই তো সবাই খুশি আজি গুনছে কেবল দিন
পাড়ায়-পাড়ায় শুনব কখন তাক-ধিনা-ধিন-ধিন!
বাতাস সতত বিরামবিহীন ব্যস্ত আপন প্রবাহে
ব্যস্ত আজিকে আমরা দ্যাখ তো প্রগতির নামে কলহে।
কোথায় আজিকে মিলনের মেলা কোথায় সময় হায়—
হাহাকার করে আকাশ বুঝিবা কোথায় তাহারে পায়!!
শুধু চারিদিন আনে প্রতিকার মা-এর পূজার তরে
সকলের তরে সকলে আমরা এসো গো আপন ঘরে।
হৃদয়ের দোর রাখিতে খুলিয়া আগল যায়রে ভাঙিয়া—
'দূরে আছ যারা'—এস ত্বরা করি সবারে আপন ভাবিয়া।
জাতপাত যাক—যাক ভেদাভেদ—হানাহানি হোক স্তব্ধ
গ্রথিত হউক একটি মালিকা সন্তান নামে লব্ধ।
শোন, কানে আসে ওই উলুধ্বনি; বরণ করিছে মাতাকে
উৎসব তাই মোহনা আজিকে মিলনের প্রাণ গাহিতে।
ঝরাপাতা যত মান-অভিমান উড়িবে বাতাসে উড়িবে
কথা-হাসি-গানে উৎসব পুনঃ নতুন দিশাটি দানিবে।।

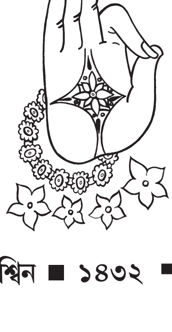

অদ্বিতীয়া

নন্দা মুখোপাধ্যায়

পঁচিশ বছর আগে—
তুমি যখন থাকতে ওই রঙচটা বাড়িটায়
আর দোতলার রেলিং-এ দাঁড়াতে
সাঁঝমুখো স্বর্ণালী সন্ধ্যায়
কখনো-বা দুপুরের রোদ্দুরে রেলিং বেয়ে তোমার একরাশ চুল
আমার তখন মনে হত, না এসব তোমার জন্য নয়
মনে মনে সাজাতাম আস্ত একটা রাজবাড়ি
গোটা আট-দশটা টিউশনি করে
তুমি যখন কালো ছাতার তলে ফিরতে
তোমার কানের পাশ দিয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ত
সেই ঘাম মাটিতে মিশে হয়ে যেত মুক্তো
তখন মনে হত এসব তোমার জন্য নয়
পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য যেন, তোমার বুকে সাজিয়ে দিতাম
তোমার মা সেলাই করত, মেশিনে—যেদিন
সে ঢলে পড়ল তোমার চোখের সামনে
তোমার সেই চিৎকার আজও কানে বাজে
মনে হত এত দুঃখ তোমার জন্য নয়
পৃথিবীর সমস্ত সুখের চাবি যেন
গুঁজে দিতাম শুধু তোমার আঁচলে
পঁচিশ বছর পর হারিয়ে গেছিলে তুমি
হঠাৎ সেদিন গাড়ির কাচের আড়ালে তোমার মুখ
পাশে বসা ভদ্রলোকটি হয়তো তোমারই সে
এসি গাড়িতে তোমার এখন ঘাম হয় না
ছোট ছোট চুলের আর রেলিং ছোঁয়ার আকুতি নেই
তোমার পার্সে রাখা আছে সব সুখের চাবিকাঠি
তবু কেন বারংবার মনে হচ্ছে ...
এ সব কিছু তোমার জন্য নয়।।

সবখানেই তিনি বিশ্বপ্রভু

গদাধর রানা

সর্বভূতে আত্মা, আর আত্মায় সর্বভূত
এমনি করেই ব্রহ্মৈকত্বের তত্ত্ব যে অদ্ভুত
বলা আছে গীতার মাঝে
স্মরণ করো সকাল সাঁঝে
আধ্যাত্মিক বিবর্তনে গীতাই অগ্রদূত।

এই দেশেরই প্রাণ ধর্ম, ভাষাও ধর্ম হয়
ভাবের মাঝেও ধর্ম আছে, ঈশ্বর তারে কয়
অন্নহীনকে অন্ন দিয়ে
দুঃখীজনের দুঃখ নিয়ে
যুগে যুগে সেই মানুষেই ঈশ্বর স্থান লয়।

ভারতমাতার সেবা করে লাভ করো ঈশ্বর
জড় ও জীবে হউক সেবা, ভুবন চরাচর
ধর্মের সার এই সত্য
এরই সাথে দৈবী তত্ত্ব
যত পারো করো সেবা সারাটি দিনভর।

জাতীয়তা, দেশপ্রেমের মাঝেই রহেন বিভু
এই চেতনায় হয়ো নাকো বিরত কভু
আমরা যাঁরে ঈশ্বর মানি
যেখানেই প্রেম সেথায় তিনি
তাঁরেই সবাই মান্যতা দেয় জগতেরই প্রভু।

ঊর্ধ্ববাহু তুলি ঈশ্বর, বলেন সবার কাছে
ধর্মপথেও অর্থ আসে, বিষয়ভোগেও আছে
শোনে না কেউ তাঁর এই কথা
ঈশ্বর পান প্রাণে ব্যথা
সেই কারণেই ভাবি ঈশ্বর রুষ্ট হয়েন পাছে।

এই জীবনে দুঃখ-শোক যতই আসুক মেলা
জানতে হবে ঈশ্বর করছেন মানবসাথে খেলা
যদিও ঈশ্বর পরম দয়াল
কভুও তিনি নয়কো ভয়াল
তাই তো তাঁরে পড়বেই মনে এলে সুখের বেলা।

অনুভব

রঞ্জন সাহা

নির্জন রাতে চাঁদের আলো গায়ে মেখে
আমি একাকী চলেছি গ্রামের সরু পথ ধরে,
এ পথ পেরিয়ে সে পথ হয়ে
থামলাম শেষে নদী চড়ে এসে।

জনমানবশূন্য চারিদিক
কলকল শব্দে প্রবাহিত জলতরঙ্গ
ঠাণ্ডা বাতাস—উন্মুক্ত আকাশ
প্রকৃতিকে উপলব্ধি করবার নির্বাক স্পৃহা
এ শুধু অনুভবের—শুধু অনুভবের।

করুণাপ্রার্থী

সুকান্ত সরকার

তুমি লোকনাথ লোকে হৃত করো
অন্ধরে দাও দৃষ্টি
মহাপাতকের ধুয়ে দাও পাপ
ফেলে করুণার বৃষ্টি।

তুমি মহাদেব, তুমি নারায়ণ
মহাবীর, রামনামে
অবতার রূপে এলে বারবার
আমাদের ধরাধামে।

মরুভূমি জাগে সবুজে সবুজে
বনে বনে ফোটে ফুল
তোমার পরশে মজা নদী নাচে
উপছায়ে দুই কূল।

প্রার্থনা এই পাশে পাশে থাকো
ভুলো নাতো কোনো ক্ষণে
দীন-দুখীজনে আগলিয়ে রাখো
সুধা দাও মুখে, মনে।

নবপত্রিকা

ভাস্কর হালদার

সপ্তমীর ওই সকালেতে
নবপত্রিকা স্নান,
ছোট্টবেলায় জানতাম যেটি
কলা-বৌ-এর চান।

এখন জানি ওই সকালে হয় যে
মা উমার মাঙ্গলিক আবাহন,
চারটি দিনের আরাধনার
আনন্দ আয়োজন।

তব নয়টি রূপ বিন্যাস মাগো
নয়টি পাতার বাহার,
নবপত্রিকা আর কিছু নয়
মায়ের নয়টি স্বরূপ আধার।

এক ব্রাহ্মণীকে দেখি মা তোমায়
কদলী পাতার রূপে।
আবার কালিকা মূর্তি ধর মা তুমি
কচু পাতার বুকে।

দেবী দুর্গার রূপটি দেখি
হলুদ পাতার পটে,
কার্তিকীর রূপে সাজো মাগো তুমি
জয়ন্তীর ওই ঘটে।

শিবা মূর্তি হও যে মাগো
ত্রিমাত্রিক বিল্বপত্রে,
রক্তদন্তিকার রূপ ধর তুমি
ডালিমের ছত্রে ছত্রে।

লক্ষ্মীরূপী হয়ে যে থাকো
সবুজ ধান্য শিষের আধারে,
শোক রহিতার রূপ ধর মাগো
অশোক শাখার পরে।

মানকচুর ওই পাতায় তোমার
'চামুণ্ডা'রই রূপ,
বজ্র হানো আকাশেতে
কাঁপায় সকল বুক।

সম্বৎসর থাকো মা তুমি
এইটুকু শুধু মিনতি,
মানব মূল্যবোধের আধারে যেন
হয় মা সবার সুমতি।

সত্যি কথা

ডা. বরুণ সেনগুপ্ত

ধর্মই বল রাজনীতিই বল
যা বাঁচা বাড়ায় উৎস নয়
তা কিন্তু নয়কো ভালো
শয়তানের প্রশ্রয় স্থল।

ধর্ম মানে বাঁচা-বাড়া
উন্নয়ন আর সুপ্রজনন
সংহতি আর উন্নতি
এর ফলেই হয়।

ফাঁকা কথার ফানুস বুনে
কতই ডিগ্রি খেতাব পেলি
মানুষের বাঁচা-বাড়ার উৎসটাকে
সমূলে সবটা খেলি।

বসে আছি

চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ

তপঃপ্রধান ত্রেতা, যোগধ্যান আর দুটি অক্ষর 'রা-ম',
হোমাগ্নি, যাগযজ্ঞ দ্বাপরে আর হল তিন অক্ষর 'কৃ-ষ্-ন'
আবার কলিতে দিলে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর
কলি শেষে সত্যের প্রারম্ভে ফের রাম ও কৃষ্ণ এলে এক দেহে—
যাগযজ্ঞ, জপ-ধ্যান, পূজা-পাঠ-মন্ত্র-তন্ত্র সব গেল ভেসে।

বিশ্বাস, ব্যাকুলতা নিয়ে শুধু এক অক্ষর—'মা'।
ব্যস, কেল্লা ফতে।
অব্যর্থ—মহামন্ত্র—'মা'!
শুদ্ধতম, সহজতম যুগমন্ত্র!
আহা, নিজেই করে দেখালে।
ঈশ্বরলাভের পথ কত সুগম সহজ করে গেলে।।

'মা'! মা গো! আমি তো তোমারই ছেলে,
ধুলো ঝেড়ে নাও, বসে আছি, যাব তোমার কোলে।।

প্রহেলিকা

নির্মাল্য দাশগুপ্ত

কে অবেলায় এই রেণু বনে?
সূর্যাস্তের ছোঁয়া লাগে নদীটির
জলে। বিদায়ের প্রান্তে জ্বলা
দীপ নিভে গেলে অন্ধকার ডেকে
নেবে কাছে। অনাবৃত কাহিনির
মন থেকে চুরি করা ফুল এখন
বিফল। মনে করো এই শেষ।
মনে করো অনারোগ্য শোক।
বিফল মালার ফাঁকে একটি কুহক
ডাক দেয় মণিকর্ণিকায় ...

প্রহেলিকা অন্ধকার বালুকার ভিড়ে ...

ঈর্ষা

প্রণয় দাশ

সুপারি ডাল যেন পাখনা
ঝেড়ে গান জুড়েছে
আর দু'-চার দিন শেষে
পাশের প্রতিবেশি ছেড়ে দক্ষিণে
যাবে নির্ঘাত
এই বারান্দা তো বর্ডার এলাকা
তবে কি ঈর্ষা-বালিশ
অপদেবতার সঙ্গে
লোফালুফি খেলবে?

আদুরে কথা

অরুণকুমার সরকার

সমস্ত প্রত্যাশার গলা টিপে
ভারি হয় রাত
জোছনা ভেজা চৌকাঠে উঁকি মারে
অবাঞ্ছিত অনুযোগ
দেহলির ওপারে বাষ্পে ভরে ওঠে বুক
অনন্ত অধীর দু'চোখ ছেনে যায়
রাত-প্রহর
অতঃপর অমীমাংসিত পিপাসা
উজান ঠেলে ঠেলে
চিনে নেয় নিবিড় ভ্রান্তি
সুগভীর নীল চোখ ধুয়ে দেয়
উদ্বৃত্ত বুনো শরীর
নিপাট বিছানার চাদরে
গুম মেরে থাকে
আদুরে কথা।

পথের ভুল

গোবিন্দ মোদক

অনেকদিন আগেই রাস্তায় নেমেছি
তারপর শুধু চলা, চলা আর চলা
একসময় চলবার গতি শ্লথ হয়েছে
দু'চোখের দৃষ্টিও ঈষৎ স্তিমিত
তবু চলবার ফাঁকে ফাঁকে দেখি
রেলিং টপকে রাস্তা চলেছে
সেইসঙ্গে চলেছে স্থির কিছু ছায়াচিত্র
আবছা অথচ কিঞ্চিৎ যেন চেনা চেনা—
মনে মনে ভাবি দৃষ্টিবিভ্রম
পরক্ষণেই ভুল ভাঙে
টের পাই আমি যে রাস্তায় চলেছি
ঠিক সেই রাস্তাটিই চলেছে উল্টোদিকে ...
আচ্ছা রাস্তাও কি পথ হারাতে পারে
ঠিক আমাদেরই মতো?

শক্তিরূপেণ সংস্থিতা

রিমা দাসমুন্সি

অন্তহীন লড়াই-এর নাম নারী
গর্ব অনুভবের নাম নারী
আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচার নাম নারী
অন্যায়-এর সাথে আপোস না করার নাম নারী
তবুও আজও নারীর কোনো দেশ নেই
যদিও কোনোদিনও ছিল না,
সত্যবতী চেয়েছিল সুবর্ণযুগ আসুক নারী স্বাধীন হোক
স্বাধীনতার বকুল ফুল ঝরে পড়ুক প্রত্যেকটি নারীর শিক্ষায়
যে শিক্ষা স্বেচ্ছাচারিতার নয়
যে শিক্ষা গর্বের, যে শিক্ষা সাহসের,
যে শিক্ষার আলো কোনোদিন নেভবার নয়,
ঠিক অন্তহীন ভোরের মতন সত্য।
যে শিক্ষার মধ্যে মিথ্যের সূর্যোদয় হবে না কখনো
মিথ্যার সূর্যোদয় না হলে অস্তও তো যাবে না।
নারীর জন্ম যেন পৃথিবীতে আজও নতুন ভোরেরই জন্ম দেয়।
যে ভোর নিস্তব্ধ, শান্ত কিন্তু অসীম সাহসী, একাকী।
বিশ্ব নারীদিবসে প্রতিটি নারীর প্রতি আমার
মনের অসংখ্য শুভেচ্ছা রইল।

অন্ধকারের আলো

সৌমিত্র দে

আজ নাকি তার মৃত্যুদিন, হায়!!
কার?
জ্বলন্ত পাবক, যার ছোঁয়ায়
শত জনমের পাপ, যেন তুষের পাহাড়
দগ্ধ, ভস্ম, নিমেষে মিলায়।
আগুনের বুঝি মৃত্যুদিনও হয়!!

আজ নাকি তার মৃত্যুদিন!!!!
কার?
সেই চিরায়ত প্রতিজ্ঞার
অমর ভাষ্য, আজও মাহেন্দ্র অনুক্ষণ
সেই মহারব, মাভৈ বাণী,
শোনরে বধির, শোনরে অভাজন

"মা আমাদের মানুষ করো"
প্রার্থনা এই—শিখায় অবিরত
ঘুম ভাঙানিয়া, পরম যতনে
আগলেছে কূল,
আজও সে কর্মে রত

ভুবনপাবন নারায়ণ, সেই
আজও বহে চলে ধরাভার
কণ্ঠে দুলায় মৃত্যু বিজয়
জগৎচন্দ্র হার
আজ নাকি তার মৃত্যুদিন?
কার!!

বীরেশ্বর অমিতবীর্য,
কিছুতে না জানি ভয়
দুবাহু বাড়ায়, রয়েছে দাঁড়ায়
বিবেক তোমার, বিবেক আমার
মৃত্যুরে করি জয়।

যেদিন ভারতে কোনো ক্ষুধিতের
শূন্য রবে না থালা
যবে দুখিনীর, কোলের মানিক
ভুবন করিবে আলা
যবে ভুলি ভেদ, শুধু ভাই ভাই
পরিচয়ে লব চিনি
অচেনা পথিক, শুধু নিজজন মানি

সেইদিন বীর, সে বীরেশ্বর,
পশারি দুবাহু খানি,শুধু হাসিবেন
সে সুধা মুরতি, বক্ষে লইবে টানি
লইবে শরণ জগৎবিশ্ব,
অন্ধকারের আলো—
নমি নরদেব, নমি ভগবান
হৃদয়-প্রদীপ জ্বালো।

হোলি

গীতা পাল

শীতের শুষ্কতা রুক্ষতার হল শেষ।
বাতাসে জাগে ঋতুরাজের রেশ।
বসন্তের মধুযামিনীতে জ্যোৎস্না রজনীতে কুঞ্জকাননে;
রাধা চিন্তায় বিভোর যখন রাধারমণ কিছুই আসে না মনে।
কুসুমিত জুঁই-মালতী পদ্মকানন—
বসন্তোৎসবের আয়োজনে উদ্যোগী হলেন শ্রীরাধারমণ
লজ্জাব্রীড়া সুন্দরী রাধা এলেন কুঞ্জদ্বারে।
এগিয়ে এসে শ্রীহরি নিলেন বরণ করে।
শ্বেতশুভ্র বসনে রাই যেন আরও মোহময়ী,
হাতে আবিরভরা থালা।
রংভরা পিচকারি নিয়ে এল শত ব্রজবালা।
এক সারিতে কৃষ্ণসহ যত সখাবৃন্দ।
বিপরীতে রাইসহ ব্রজঙ্গনাগণ করে কত রঙ্গ।
শুরু হল আবির ছোড়া আকাশ-মাটি লালে লাল।
স্ফটিকস্বচ্ছ গুলাল কুণ্ডে লাগল যেন প্রেমের জোয়ার।
মরাল-মরালী ভ্রমর-ভ্রমরী ডালে বিহঙ্গী করে আনন্দ কূজন।
মধু বৃন্দাবনের কোণে কোণে স্ফুরয়ে প্রেমের শিহরন।
পিচকারি ছোড়ে বিনোদিনী আর নয়নে চায়।
আনন্দোৎফুল্ল শ্রীহরি আহ্লাদে শিহরিত হয়
মুঠো ভরে আবিরে রাঙায় শ্রীরাধার স্বর্ণাভ কপোল শ্রীঅঙ্গ।
দেখে তাহা পুলকিত আনন্দবিহ্বলা যত সখিবৃন্দ।
নীল-সবুজ-রাঙা আবিরে ভিজল ঘাগরা কাচুলি চোলি।
ব্রজপুরী ভাসিয়ে দিল নব-বসন্তের হোলি।
বর্তমানে মর্ত্যধামেও পরস্পর রাগ বিদ্বেষ ভুলে
রং-আবিরে মাতে।
ঋতুরাজের আগমনে সব জাতি আনন্দ-উৎসবে মাতে।

ধ্যানমগ্ন

তাপস ভট্টাচার্য

ধূসর গোধূলিবেলায়—সূর্য ঢলেছে পশ্চিমে;
বিসর্জনের সিঁদুরখেলায় মেতেছে প্রকৃতি।
একটা-দুটো উজ্জ্বল তারকা উঁকি মারছে আকাশে;
নদীবক্ষে তরণী চলেছে এপার থেকে ওপারে
ধীর পদক্ষেপে অন্ধকার কায়েম করে আপন অধিকার।
সুদূর নক্ষত্রলোকের আলোর রেখা ধরে এগিয়ে
চলেছে মৌন তাপস, এ যেন অন্য আমি,
দূরে নদীতটে পড়ে আছে জড়দেহ নিস্তব্ধ নিথর।
দূর হতে শোনা যায়—জনতার মৃদু কলধ্বনি;
ছিন্ন করি মায়াপাশ আমার অনন্ত গতি
আলোকের পথে সত্যের সন্ধানে।
ধূম্র জটাজাল ভেদি মহাকালের রুদ্র হুঙ্কারে,
জন্মেছিল আদিম ব্রহ্মাণ্ড; শিব-শক্তি মেতেছিল সৃষ্টির উল্লাসে।
এই পথে এসেছিল—
বুদ্ধ-চৈতন্য-যিশু, ব্রজের কানাই;
সুধারসে মেতেছিল মধু বৃন্দাবন।
এই পথে ধর্মক্ষেত্রে কৃষ্ণসখা দেখেছিল;
সৃষ্টির অনন্ত মাধুরী। এই পথ অনুসারী একদিন এসেছিল
স্বর্গভ্রষ্ট মনুর সন্তান। যুগান্তরে সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যমণি;
প্রেমের ঠাকুর এই পথে এসেছিল বুঝি,
চৈতন্যের সুধাভাণ্ড লয়ে জর্জরিত; মর্ত্য মানবের তরে।
জানা নেই এই পথ—
মিলেছে কোথায়? কোটি সূর্যের মহাজ্যোতি,
ব্রহ্মশক্তি রূপে বুঝি বিরাজিছে তথা।
অসংখ্য আলোকধারা পুঞ্জীভূত নভোতলে জ্যোতিপুঞ্জরূপে;
ব্রহ্ম সনে ব্রহ্ম সনাতনী বিরাজিছে চিরশান্তি সুধা-মহানন্দময়।
জন্ম-মৃত্যুর সীমানা পেরিয়ে নক্ষত্রলোকের
আলোকিত পথে আমার অনন্ত যাত্রা সত্যের সন্ধানে।

রামভক্ত তুলসীদাস

চন্দনা সান্যাল

উত্তরপ্রদেশের রান্দা জেলায় ছিল অতি সাধারণ এক ব্রাহ্মণ দম্পতির বাস। ব্রাহ্মণের নাম ছিল আত্মারাম দুবে। তাঁর পত্নীর নাম ছিল হুলসী দেবী। ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের ঘরে জন্ম নিল এক পুত্রসন্তান। শুভ মুহূর্তে মায়ের মনে আনন্দের পরিবর্তে নেমে এল দুঃখের ছায়া। কারণ? গর্ভস্থ শিশু মাতৃগর্ভে ছিল ১২ মাস এবং জন্ম নিল মুখে সব দাঁত নিয়ে। আবার যে সময়ে জন্ম, তার রাশিগত ফলও বিপজ্জনক। মাতা-পিতার মৃত্যুযোগ। এর একমাত্র প্রতিকারের উপায় হল জন্মমুহূর্তে সন্তান ত্যাগ অথবা প্রথম আট বছর পুত্রমুখ দর্শন না করা।

এই পরিস্থিতিতে কোনো নামকরণ উৎসবের কথা চিন্তার বাইরে। এদিকে মা হুলসী দেবীও মারা গেলেন। অবস্থা বিপাকে এবং সংস্কারবশে পিতা পুত্রকে ত্যাগ করলেন। যে ধাত্রী মা শিশুটিকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছিলেন, তাঁর শাশুড়ি চুনিয়ার স্তন্যদুগ্ধে শিশুটি বড় হতে লাগল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শিশুটির পাঁচ বছর বয়সে চুনিয়ারও মৃত্যু হল। অসহায় বালক ভিক্ষা করে দিন কাটায় আর আশ্রয় নেয় হনুমান মন্দিরে। এই পরিত্যক্ত দুর্ভাগা বালকই ভক্তশ্রেষ্ঠ সন্ত তুলসীদাস। যাঁর রামনাম ভক্তিস্রোতে আজও সারা ভারতবর্ষে প্লাবিত।

আত্ম উদাসীন তুলসীদাস নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলে যাননি। তাঁর জীবনচিত্র তাই অনেকাংশেই সঠিকভাবে জানা যায় না। অনেকেই তাঁর জীবনচরিত লিখেছেন। তাঁর সমসাময়িক বেণীমাধব দাসের 'গোসাই চরিত, যা মূল গোসাই চরিতের সাথে কিছুটা মিল আছে। রঘুবরদাসের 'তুলসী চরিতে'ও উল্লিখিত সব ঘটনাকে প্রমাণ বলে ধরা যায় না। পরবর্তীকালে তুলসীদাসের ওপর গবেষণার ফলে অনেক তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। তুলসীদাসের জীবনীর মধ্যে কোথাও সেইরকম বালক বয়সের বা গার্হস্থ্য জীবনের কথা বিশেষ জানা যায়নি।

মানুষের মনে লুকিয়ে থাকে এক আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা। বৈদিক ও বৌদ্ধযুগের পরে ভারতবর্ষে আসে ভক্তি আন্দোলনের জোয়ার। রামানুজাচার্য এই আন্দোলনকে জোরদার করে তোলেন। ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী রামানন্দ, কবীর, মীরাবাঈ এঁদের মধ্যে দিয়ে ভক্তিবাদের চরম বিকাশ। এই ঐতিহ্যেরই ধারক ও বাহক তুলসীদাস।

তুলসীদাসের জীবনের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা আচার্য রামানন্দের শিষ্য নরহরিদাসের আগমন। এই নরহরিদাস স্বপ্নে নির্দেশ পান পরিত্যক্ত বালককে নিজের কাছে নিয়ে এসে তাঁকে রাম কাহিনি শুনিয়ে তৈরি করে তোলার জন্য। তখন তুলসীদাস নামে কেউ জানত না, রামবোলা নামে পরিচিত ছিল, তাকে খুঁজে বের করা হল। নরহরিদাস তাকে অযোধ্যায় নিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন দিলেন। এবারে বালকের নাম হল তুলসীরাম যা পরে হয়েছে তুলসীদাস-এ। দশ মাস অযোধ্যায় বাসের পর গুরু-শিষ্য চলে এলেন সরযূ ও সাগরের সঙ্গমস্থল সুখকর ক্ষেত্র। এখানে পাঁচ বছর শ্রীরামের অনুধ্যান তুলসীর মন ভরিয়ে তোলে। ভারাতীত এক আনন্দে হৃদয়ে অহরহ অনুরণিত হতে থাকে রামায়ণের অমর কাহিনি।

এর কিছুদিন পরে তুলসীর জীবনে আসেন সাধু শেষ সনাতন। ইনি তুলসীদাসকে মহাবিদ্যা ক্ষেত্র বারাণসীতে নিয়ে যান। বারাণসীতে তুলসী পাণিনির ব্যাকরণ সহ দেবভাষা সংস্কৃত শিক্ষা করেন। প্রখর ধীশক্তিমান তুলসী প্রখর শ্রুতিধর ছিলেন; একবার মাত্র শুনেই অনেক কিছু তাঁর আয়ত্তে এসে যেত। তাঁর ভাষার বিশেষ জ্ঞান লেখার মধ্যেই পরিস্ফুটিত। রত্নাবলী নামে এক মহিলাকে তুলসী বিবাহ করেন। তারক নামে তাদের একটি

লেখিকা—বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গ্রন্থকার।

● ভগবান শ্রীরামচন্দ্র।

পুত্রও হয়। যদিও সে বেশিদিন বাঁচেনি। স্ত্রী রত্নাবলির প্রতি তাঁর আসক্তি এত বেশি ছিল যে তাই নিয়ে অনেক কাহিনি শোনা যায়। একবার রত্নাবলি বাপের বাড়ি যায়। রাত্রে তুলসী উত্তাল যমুনা পার হয়ে তাঁর কাছে আসে। রত্নাবলি স্বামীকে তিরস্কার করে বলে—

"হাড় মাংস মায়াদেহ মাম্ তসো জাইসি প্রীতি।
ঐসি গো শ্রীরাম মে হো ত না ভয় না ভীতি।।"

আমার এই হাড়মাস ভরা দেহের উপর তোমার যত ভালবাসা, সে ভালবাসা শ্রীরামের উপর অর্পণ করলে তোমার সব ভয় দূর হত।

এই তিরস্কার তুলসীর মনের ভিতর বিশেষভাবে আঘাত করে। অন্তরতম অন্তরে তো বিরাজিত ছিলেনই শুধু প্রকাশিত হবার অপেক্ষা ছিল। এই আঘাতে সেই সংযোগ সাধন হল। তুলসী স্ত্রী এবং ঘর ছাড়লেন। সারা ভারতের তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করে তাঁর অমৃত বাণীতে কত না জনমানবের পরিবর্তন ঘটালেন সাধক কবি তুলসীদাস—রামচরিত মানসের স্রষ্টা ভক্ত তুলসীদাস।

আবার বারাণসী গেলেন, সেখানে দৈবাদেশ হল অযোধ্যায় গিয়ে স্থানীয় ভাষায় রামায়ণ লেখার। রামায়ণ রচনার পিছনে অনেক প্রচলিত কাহিনি আছে। শোনা যায়, হনুমান পাথরের উপর নখ দিয়ে রামকাহানি লিখে শ্রীরামের কাছে গিয়ে দেখায়, শ্রীরাম দেখে বললেন এ ব্যাপারে বাল্মীকির অনুমতি চাই। হনুমানের রামকথা দেখে বাল্মীকি বুঝতে পারলেন এই রামকাহিনি প্রচলন হলে তাঁর রামায়ণ আর তেমনভাবে সমাদৃত হবে না। তাই মহামুনি কৌশলে হনুমানকে তাঁর লেখা সাগরে বিসর্জন দিতে বলেন। হনুমান রাজি হলেন কিন্তু সেইসঙ্গে ভবিষ্যৎবাণী করেন। অদূরকালে তুলসী নামে এক ব্রাহ্মণকে তিনি তাঁর রামকথা প্রচলনের মাধ্যম হিসাবে নির্বাচন করবেন। এই তুলসীদাস রচিত সাধারণ ভাষায় রামায়ণ কথা লোকের মুখে মুখে ফিরবে যাতে বাল্মীকি রামায়ণের পঠন-পাঠন ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

অযোধ্যায় গিয়ে তুলসী দেখেন বটবৃক্ষের ছায়ায় এক নিভৃত কুঞ্জে তাঁর জন্যে আসন বিছিয়ে রেখেছেন এক সাধু, যাঁর কাছে ইতিমধ্যে তাঁর আসার খবর পৌঁছে গেছে। দিনটি ছিল ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের রামনবমীর দিন। ত্রেতাযুগে শ্রীরামের জন্মসময়ে আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলীর যেভাবে সমাবেশ হয়েছিল, এদিনেও ঠিক সেই পরিবেশ। এই পরিস্থিতিতে তুলসীদাসের রামসাধনার শুরু। বাস্তবিক পক্ষে তুলসীর সারাজীবনের সাধনার প্রকাশ তাঁর গ্রন্থের মাধ্যমে। তাঁর প্রার্থনা, তার অন্তরের আকুতি, তাঁর রচনার মাধুর্যের সঙ্গে মিশে আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে অঞ্জলির মতো নিবেদিত।

রামচরিতমানস রচনায় লেগেছে দু'বছর সাত মাস ছাব্বিশ দিন। সমাপ্তি রাম-সীতার বিবাহের দিন। মার্গশীর্ষ মাসে।

আবার বারাণসী ফিরে এলেন। তুলসীদাসের ভালবাসায় সবাই আকৃষ্ট হয়। তুলসীর এই জনপ্রিয়তায় রুষ্ট হয়ে ওঠেন গোড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা। তাঁরা দুটি চোরকে তুলসীদাসের লেখা গ্রন্থটি চুরি করবার জন্য ঠিক করেন। তুলসীদাসের কুটিরের সামনে চোর দুটি দেখেন একটি দুর্বাদলশ্যাম, অন্যটি শুভ্রকান্তি ধনুর্বাণ হাতে তুলসীদাসের বইটি পাহারা দিচ্ছে। পরদিন তারা গিয়ে তুলসীদাসকে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা জানায়। রাম-লক্ষ্মণের কৃপার কথা স্মরণ করে তুলসীর চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। ভক্তের ভগবান শরণাগতের পরিত্রাতা।

তুলসীদাস ও তখনকার পণ্ডিতদের নিয়ে অনেক কাহিনির প্রচলন আছে। রামনাম করে এক দুষ্ট লোক ভিক্ষা করে বেড়াত। তুলসীদাস তাঁকে পছন্দ করতেন এবং খেতেও দিতেন। এই ঘটনায় রুষ্ট পণ্ডিতেরা তুলসীদাসের কাছে কৈফিয়ত দাবি করেন। তুলসীদাস তার উত্তরে বলেন রামনাম এত পবিত্র যে সে নাম সর্বদোষ হরণ করে। রামনাম এই দুষ্ট লোককে পবিত্র করে তুলেছে। ব্রাহ্মণেরা ছেড়ে দেবার পাত্র নয়, তাঁরা পরীক্ষা করতে চাইলেন। বললেন এর প্রমাণ দেখাতে হবে। তাঁরা বললেন, এই শিবমন্দিরের নন্দীর পাষাণ মূর্তি যদি এই দুর্বৃত্তের হাত থেকে খাবার গ্রহণ করে তবেই এই দুষ্টু ভিখারি যে পবিত্র হয়েছে তা বিশ্বাস হবে সকলের। নির্দিষ্ট দিনে সকলে অবাক বিস্ময়ে দেখল পাথরের নন্দী সত্যিই সেই দুর্বৃত্তের হাত থেকে খাবার গ্রহণ করল। রামনামে পবিত্র ধারায় সে আজ পবিত্র, পরিশুদ্ধ।

এই ঘটনায় তুলসীদাসের জনপ্রিয়তা বাড়ল বটে কিন্তু রুষ্ট ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণদের তাঁর প্রতি রোষানল অসহ্য হয়ে উঠল। তখন তুলসীদাস হনুমানজির কাছে সাহায্য চাইলেন। তুলসীদাস মনের সব কথা সকল বেদনা জানাবার আদেশ পেলেন শ্রীরামের কাছে।

প্রাতঃস্নানের জন্যে ঘাটে যাবার পথে রাস্তায় এক বটবৃক্ষে তুলসীদাস নিয়মিত জল দিতেন। সেই গাছে ছিল এক প্রেতাত্মার বাস। তুলসীদাসের প্রাত্যহিক জলদানে সেই প্রেত মুক্তিলাভ

করে এবং তুলসীদাসকে তাঁর কিছু আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দিতে ইচ্ছা করে। তুলসীদাসের একমাত্র কাম্য শ্রীরামের দর্শন। তুলসীর আর্তিতে সেই প্রেত বলে যে, আপনি যখন ঘাটে রামকথা আলোচনা করেন, তখন এক বৃদ্ধ সর্বপ্রথম সেখানে আসেন আর সব শেষে সেই জায়গা থেকে উঠে যান। তিনিই আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। যথারীতি ঘাটে তাঁকে দেখে তুলসী বুঝলেন যে এই বৃদ্ধ আর কেউ নয় স্বয়ং হনুমান। তুলসীদাসকে তিনি চিত্রকূটে যাবার নির্দেশ দিলেন।

চিত্রকূটে বাস করার সময় তুলসীদাসের কাজ হল ভক্তজনমধ্যে চন্দন বিতরণ করা। একদিন চন্দন বাটার সময়ে শ্রীরাম উপস্থিত হয়ে চন্দন চাইলেন। হঠাৎ করে আরাধ্য দেবতাকে সামনে দেখে তুলসীদাস সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। শ্রীরাম নিজের হাতে ভক্তের ললাটে চন্দন লেপে দিলেন। তুলসীদাসের এই সমাধি অবস্থা তিনদিন ছিল। শ্রীরামের দর্শনে তুলসীদাসের এই প্রথম ভাবসমাধি হল। শ্রীরামচন্দ্রের অর্পিত প্রাণ তুলসীর কাছে শ্রীরামই সর্বস্ব ধন। তাই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে গোবর্ধনধারীর স্বর্গীয় রূপে তুলসীর মন ভরেনি। প্রভুর হাতে যদি ধনুর্বান না থাকে তুলসীদাসের মাথা নত হয় না প্রণামে। তুলসীদাসের আর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ ধরেন রামরূপ বাঁশির বদলে ধনুকবান।

একবার সম্রাট জাহাঙ্গির তুলসীকে দেখে তাঁকে কিছু অলৌকিক বিভূতি দেখাতে বলেন। তুলসীদাস বলেন, আমি রামনাম ছাড়া আর কিছুই জানি না। সম্রাট রেগে গিয়ে তুলসীদাসকে বন্দি করেন। কথিত আছে একদল বাঁদর ওই বন্দিশালা তছনছ করে ভেঙে ফেলে। সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজের ভুল বুঝে তুলসীদাসকে মুক্তি দেন।

জীবনের শেষে এসে তুলসীদাস বার্ধক্য ব্যাধিতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাতে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। এই সময়ে তাঁর লেখা 'হনুমান বহুক' বইটিতে তিনি হনুমানের প্রশস্তি রচনা করেন এবং এই বেদনাদায়ক অসুখ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করেন। তিনি রোগমুক্ত হলেন। ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে বারাণসীর অসিঘাটে তুলসীদাস অমরলোকে যাত্রা করেন।

তুলসীদাসের সব রচনাই শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে। তবে কৃষ্ণগীতাবলি ও পার্বতীমঙ্গল নামে তাঁর দুটি বই আছে। বাল্মীকি রামায়ণের উপর ভিত্তি করে লেখা হলেও রামচরিতমানসে কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণের বেশি ঘটনা আছে। অধ্যাত্ম রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণের তুলনায় সংক্ষিপ্তকার। বাল্মীকি রামকে আদর্শ পুরুষ হিসাবে চিত্রায়িত করেছেন। আধ্যাত্ম রামায়ণে রামকে পরম ব্রহ্ম হিসাবে কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে। বাল্মীকি রাবণকে একজন দুষ্কৃতিকারী রাক্ষস ছাড়া আর কিছু ভাবেন না, অধ্যাত্মে রাবণ বিদ্বেষভক্তির মাধ্যমে আত্মমুক্তি প্রত্যাশী।

তুলসীদাসের কাছে শ্রীরাম সেই চিরভাস্বর সচ্চিদানন্দ যার কোথাও কোনো মায়ার আবরণ নেই। এই নিরাকার নির্বিকল্প ব্রহ্মস্বরূপকে তুলসীদাস নিয়ে এসেছেন আমাদের কল্পনার আওতার মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনের দৈনন্দিন প্রার্থনায়। আমাদের সচেতনতাকে জাগ্রত করে তুলতে নিরাকার ব্রহ্ম জন্ম নিয়ে লীলা করে গেছেন এই মাটির পৃথিবীতে। আমাদের সেই অধরা আদর্শকে ধরিয়ে দেবার জন্যই তাঁর মানবদেহ ধারণ।

তুলসীদাসের রামচরিতমানসে শিব-দুর্গার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে শ্রীরামের স্বরূপের প্রকাশ। দেবাদিদেব মহাদেবের মানস সরোবরে প্রস্ফুটিত রামচরিত রূপ শতদল পদ্ম। সেই পদ্মের বর্ণনা পার্বতী শুনছেন দেবাদিদেবের কাছে। দশরথ তনয় রাম নিঃসন্দেহে নরোত্তম। কিন্তু মানুষকে ব্রহ্মস্বরূপ বলে স্বীকার করা যায় কি? পার্বতীর এই প্রশ্নের উত্তরে শিব বলেন,সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্মে কোনো ভেদ নেই। অজাত, অনাদি, নিরাকার ব্রহ্ম অবশ্যই নিজেকে সগুণ সাকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। যেমন জল আর বরফ। দুই-ই এক। ভক্তি হিমে জল জমে বরফ হয়। শ্রীরামই সেই অনাদি অনন্ত, সর্বব্যাপী পরমাত্মন।

এই অনাদি ব্রহ্মারই এক অংশ জীব। কিন্তু জীব মায়াপাশে বদ্ধ। চেতন ও জড়ের মধ্যে এই বন্ধন বা মায়া ছেদন করা অতি দুষ্কর। মিলন-বিরহ ভাল-মন্দ বন্ধু-শত্রু জীবনে নানা ধরনের অভিজ্ঞতা সেই পরমপুরুষের খেলা। জন্ম-মৃত্যু, ভোগ-অভাব, কর্ম ও সময়ের শৃঙ্খলে বদ্ধ মানুষ আসক্তিবিহীন, যোগীর চোখ নিয়ে পৃথিবীকে দেখলে বুঝতে পারে—'তুমি কার, কে তোমার?' পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। ধন-জন-মান-ঐশ্বর্য, স্বর্গ-মর্ত্য—সকলই অলীক। যদি কোনো রাজা স্বপ্নে দেখেন তিনি রাজ্যপাট হারিয়ে ভিখারি হয়েছেন, অথবা যদি কোনো ভিখারি দেখে সে ইন্দ্রত্ব পদপ্রাপ্ত হয়েছে, ঘুম ভেঙে সে আবার নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। তার কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। সাধকেরা 'নেতি নেতি' করে যে পরমব্রহ্মের সন্ধানে ফেরেন, শ্রীরামচন্দ্র সেই অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অনাদি, অদ্বয়, অবিকারী পরমপুরুষ।

আমি আমার, তুমি তোমার, এর নামই মায়া। এইভাবেই জীব আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মহামায়ার মায়ার খেলাও দু'রকমের—

বিদ্যামায়া মুক্তিপথের সন্ধান দেয়। 'জপাৎ সিদ্ধি' শ্রীমা সারদার অমৃতবাণীর পূর্বাভাস তুলসীদাসের রচনায়—রামনাম জপে মোক্ষ। ভুলেও একবার রামনাম উচ্চারণে মুক্তিপথের দিকে অগ্রসর হওয়া। কর্ম করে যাওয়া নির্লিপ্ত হয়ে; সবের মধ্যে থাকা সকলের সাথে ওঠাবসা, কিন্তু মনটি দিয়ে রাখা শ্রীরামের পাদপদ্মে। শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ যে বলতেন সংসারে থাকবে বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো।

যে সময় ভারতবর্ষে মুসলমান ধর্মের প্রাধান্য, শাসক পদে আসীন মুসলমান প্রশাসক, সেই সময় রামচরিতমানস সনাতন ধর্মের প্রতি জনমানসে শ্রদ্ধা ও প্রীতি জাগিয়ে তুলল। পবিত্র গার্হস্থ্য জীবনযাপন করে ভগবানের উপর ঠিক ঠিক ভালবাসা ও ভক্তি নিয়ে পথ চললে অবশ্যই ভগবান জীবনতরীর কাণ্ডারী হয়ে হাল ধরলেন। ধর্ম মানে কোনো অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক বিদ্যার প্রদর্শন নয়, ধর্ম মানে সৎ পথে থেকে তাঁর স্মরণ-মনন নিদিধ্যাসন, শ্রীরামের শরণাগত হয়ে থাকা। অহংকে বিসর্জন দিয়ে আত্মবুদ্ধি সমর্পণ করে 'দাস আমি' হয়ে দিনযাপন। এই সাধনা এই আরাধনার অভ্যাস সাধারণ মানুষেরও সহজলভ্য। তুলসীদাস কোনো মতবাদ প্রচার করেননি। কোনো সম্প্রদায় সৃষ্টি করেননি। তবু তাঁর ভক্তির প্রাবল্যে এবং দোহা ও চৌপাইয়ের মূর্ছনায় সমগ্র উত্তর ভারত আজও প্লাবিত।

ইংল্যান্ডে বাইবেলের যত পরিচিতি গাঙ্গেয় উপত্যকায় রামচরিতমানসের তার থেকেও বেশি সমাদর।

রামচরিতমানস ছাড়াও তুলসীদাসের অন্যান্য বেশ কিছু রচনা আছে। ৫৭৩ দোহায় ব্রজভাষায় রচিত দোহাবলি, রাজারামের রাজকীয় বর্ণনায় কবিতাবলি, বিভিন্ন রাগে ৩৩০টি গানের সমাহার গীতাবলি, বিনয়, পত্রিকা—শ্রীরামের দরবারে বিচারের আবেদনে লেখা। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ৬১ গানের অর্ঘ্য কৃষ্ণবলি। এছাড়া ছোটখাটো রচনা যেমন বৈরাগ্য সন্দীপনী, রামলালা নাচাউ রামাজ্ঞা প্রশ্ন, বহুপঠিত হনুমান চালিশা, বিভিন্ন শুভ কর্ম যেমন উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি সংস্কারের আরম্ভে তুলসীদাসের এইসব বই থেকে পাঠ বা গান করার প্রচলন আজও চলে আসছে।

বিশ্বের উদ্ভব স্থিতিলয় আদি সর্বহেতু জীবে করি মায়াবদ্ধ, আপনি যে মুক্ত সেতু—সীতাপতি, শ্রীরামচন্দ্রকে এই ভাব নিয়েই জনসমাজে প্রচার করেছিলেন তুলসীদাস। আর তাই সন্ত কবি তুলসীদাসের পথ ধরে আমরাও প্রণাম জানাই সেই অযোধ্যানাথ রঘুপতি রাঘব রাজারামের শ্রীপাদপদ্মে—

চিন্ময় অব্যয় ব্রহ্ম ধরিলা মানব রূপ।
দেবগণ অনুরোধে সূর্যবংশে জন্মি ভূপ।।
নাশিয়া রাক্ষস বংশ স্থাপিয়া অমর কীর্তি।
সর্ব পাপ দূর করি পুণ্যময় তাঁর স্থিতি।।
সেই আদি সনাতন পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ।
সীতাপতি পদে মতি, স্মরি সদা রামায়ণ।।

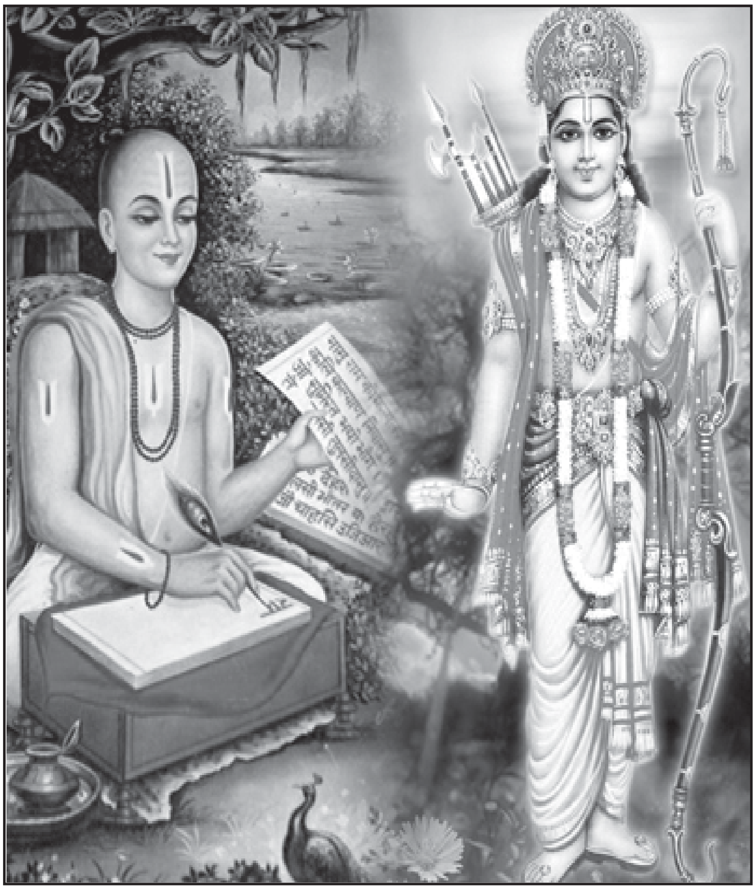

● রামভক্ত মহাত্মা তুলসীদাস।

লাটু মহারাজ

অধ্যাপিকা সবুজকলি সেন

শিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনায় Man Making Education—এই শব্দবন্ধটি স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মানুষ গড়ে তুলবার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার কথা বিশেষ আলোচিত হয় না; শ্রীশ্রীঠাকুরের Man Making Education মূর্ত হয়েছিল বিহারের ছাপরা জেলার এক অখ্যাত গ্রামের বালক রাখতুরাম, রামচন্দ্র দত্তের গৃহসেবক লাল্টুর, তাপস লাটুতে উত্তরণে এবং বেদান্তবিদ স্বামী অদ্ভুতানন্দে পরিণতিতে। নরেন্দ্রনাথ সহ শশী, শরৎ, সারদা, কালী প্রমুখ ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকদের গড়ে তোলার সময়েই সমাজের অবহেলিত, নিষ্পিষ্ট মানুষের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত দেবত্ব, সুষুপ্ত জ্ঞান থাকে তার বিকাশেরও কাজ করে যাচ্ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং সেই যুগে যখন হিন্দু ধর্মে অব্রাহ্মণের সন্ন্যাসের অধিকার ছিল না, সন্ন্যাস নাম স্বামী অদ্ভুতানন্দ কিন্তু রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে তিনি লাটু মহারাজ নামে উল্লিখিত হন।

বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামের অনাথ বালক—নাম রাখতুরাম। যিনিই নাম রাখুন না কেন—বাবা-মা অথবা অন্য কেউ—নামটি অর্থবহ। রাখতুরাম রাম যাকে রেখেছেন অথবা আকুতি রাম তু রাখ। রাম তুমি রাখো। তাই পিতৃব্য অর্থাৎ কাকার সঙ্গে কলকাতায় এসে যাঁর বাড়িতে তিনি গৃহকাজে নিযুক্ত হলেন তিনি রামচন্দ্র দত্ত। পূর্ব পূর্ব জন্মের সুকৃতিতে, নিজ সংস্কারে যাঁর কাছে পরম আশ্রয় পেলেন তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস রামচন্দ্রের গুরু। অর্থাৎ রামই রেখেছেন—যে রাম সেই কৃষ্ণ—ইদানীং রামকৃষ্ণ নিজ মুখে তিনি বলেছেন—সেই অলৌকিক পুরুষের সঙ্গে থেকে কিভাবে একটি মানুষের জীবনস্রোত পরিবর্তিত হয়ে উচ্চ অবস্থায় ওঠে—লাটু মহারাজের জীবন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন ১৮৭৯ সালে। এবং সেই বছরেই বালক লাটু বা লাল্টুর সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয়। রোমাঁ রোঁলাও ঠাকুরের যে জীবনীগ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন সেখানে ১৮৭৯ সালে দীক্ষিত মাত্র চারজন ভক্তের মধ্যে রামচন্দ্র দত্ত ও লাটু মহারাজের নাম দিয়েছেন।

সেদিক থেকে দেখতে গেলে ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে লাটু মহারাজই প্রথম শিষ্য ও সব থেকে কম বয়সে আসেন এবং আসেন তাঁর মালিক রামচন্দ্র দত্তর সঙ্গেই। রামচন্দ্র দত্তর স্মৃতিচারণায় দেখা যায় প্রথম দিনই নিত্যসিদ্ধ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের পাথর চাপা ফোয়ারার সঙ্গে তুলনা করেন এবং হঠাৎ লাটু মহারাজকে স্পর্শ করেন। সেই স্পর্শে লাটু মহারাজ ভাববিহ্বল হয়ে পড়েন। সেদিনই রামচন্দ্রকে ঠাকুর বলেন—ওকে এখানে মাঝে মাঝে পাঠাবি। লাটুও মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন কোনো কিছু নিয়ে। দ্বিতীয় দর্শনের পর লাটু সেই বাঁশির ডাক শুনলেন যা মানুষকে ঘর ছাড়া করে অসীমের পথে নিয়ে যায়। এর পরেও কিছুদিন তাঁকে রামবাবুর বাড়িতে থাকতে হয়। এরপর এল দক্ষিণেশ্বরে থাকার সুযোগ। ১৮৮১ সালের জুন মাসে হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মন্দির কর্তৃপক্ষের মনোমালিন্য হওয়ায় হৃদয় মুখোপাধ্যায়কে মন্দির ত্যাগ করতে হয়, তখন লাটু মহারাজকে দক্ষিণেশ্বরে রেখে দেন রামচন্দ্র দত্ত। এটিই হল স্বামী অদ্ভুতানন্দের জীবনের স্রোত পরিবর্তনের প্রথম অধ্যায়, যাঁর লক্ষ্য ছিল বড়বাজারের পালোয়ান হওয়া, তিনি পরাবিদ্যার রাজপথে উঠলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে থাকার সুযোগ পেলেন এই সরল বালকটি। ঠাকুরও কাছে টেনে নিলেন।

লেখিকা—বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

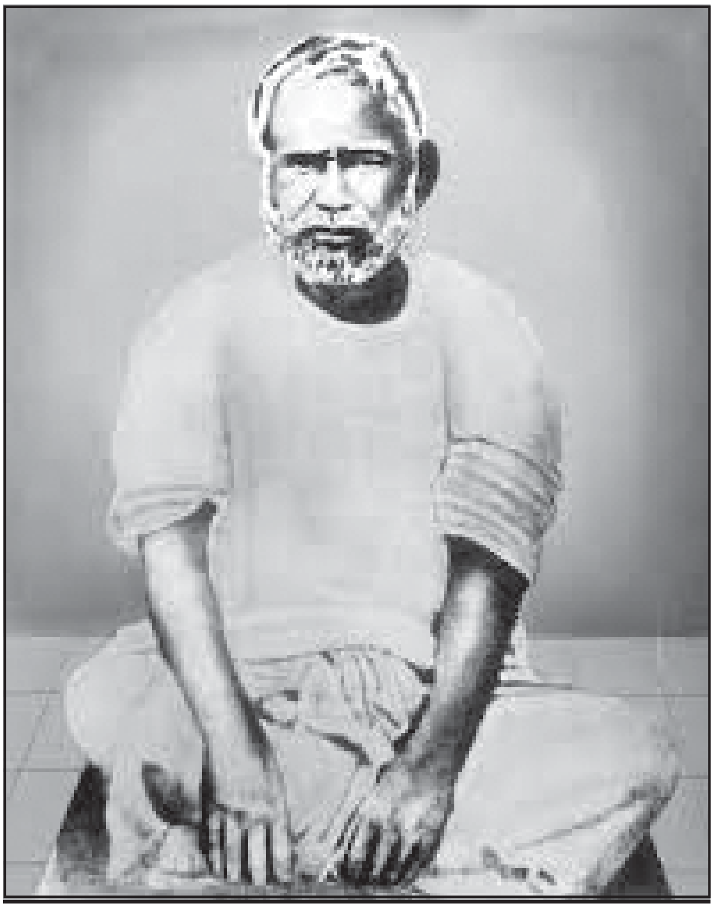

● লাটু মহারাজ।

সে যেন তখন পরমহংস মশায়ের স্বগোষ্ঠী ও অন্তরঙ্গগণের ভিতর থাকিত। কোনো উঁচু নিচু ভাব থাকিত না। লাটুও কোনো বিষয় বুঝিতে না পারিলে তাঁহার সঙ্গে প্রায় ঝগড়া করিত, নিজের মতামতও ব্যক্ত করিত।"

লাটু মহারাজ সেই একমাত্র ভাগ্যবান যাঁকে ঠাকুর বর্ণ পরিচয় করাবার চেষ্টা করেছিলেন এবং ক, খ-তেই সমাপ্ত হয়েছিল। লাটু মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর যা বলতেন ভক্তদের কাছে সবগুলি মন দিয়ে শুনতেন এবং এই শ্রবণের ফল আমরা দেখি তাঁর উত্তর জীবনে। শ্রীঠাকুরের সঙ্গে সব জায়গায় যেতেন বলে নানা প্রকার কথা নানা পরিবেশে শোনার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। এইভাবে নতুন করে নতুন জীবন যেন তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেতে লাগল।

তাঁর প্রকৃত তাপস জীবন শুরু হল কাশীপুর উদ্যানবাটীতে— পূর্বজন্ম, পূর্বভাব, পূর্ব প্রকৃতি শূন্যে মিলিয়ে গেল। নতুন জীবন, নতুন উদ্দেশ্য, নতুন অবস্থা নিয়ে আরেকজন দেখা দিল। কাশীপুরে সবার ভিতরেই অল্পবিস্তর পরিবর্তন হয়েছিল কিন্তু লাটু মহারাজের পরিবর্তন বিশেষ ভাবে লক্ষ করার মতো ছিল। পতঞ্জলি যোগশস্ত্রে বলা হয়েছে যে, "সিদ্ধিলিপ্সু যোগীর যোগ যখন অত্যন্ত তীব্র হয়—যোগী বা তাপস তখন অন্য জাতি হইয়া যান, তিনি তখন মনুষ্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার সেই মানবদেহ ও মানবমন তখন অত্যন্ত পরিবর্তিত হইয়া যায়।"

এখন থেকে রাখতুরামের ধ্যান-জ্ঞান শ্রীরামকৃষ্ণ। সকালে উঠে একদিন চোখে হাত চাপা দিয়ে সরল বালক ডাকছে "আপুনি কোথায়"? অর্থাৎ নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে ওহে অন্তর্যামী/প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিব স্বামী। প্রতিদিন সকালে উঠে প্রথমেই সেই শ্রীমুখ দর্শন, রাত্রেও তো সেখানেই শয়ন। মাকেও সাহায্য করতেন তিনি। সৌভাগ্যবান লাটু জগন্মাতা ও পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ পেলেন পিতামাতা রূপে। শুরু হল পরিবর্তন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন "তাহার পূর্বকার বৃত্তিভোগী দাস ভাবটা তিরোহিত। রামচন্দ্র দত্তর কাছ থেকে মাইনে নেওয়া ত্যাগ করলেন। সেবা করার জন্য যেন তাঁর ভিতর অন্য ভাব এল।"

তিনি লিখেছেন, "যখন লোকজনের ভিড় কম হইত, তখন পরমহংস মশাই লাটুকে অতি নিকটে বসাইয়া কথাবার্তা কহিতেন,

যাঁকে সবাই মাথা পাগলা ভাবতেন তিনি গম্ভীর ধীর-স্থির তপস্বী হয়ে উঠলেন। নরেনবাবু, শরৎবাবু হলেন হ্যারে লরেন, হ্যারে শরট, সকলের সঙ্গে সমানভাবে কথা, আবশ্যক হলে তর্ক-বিতর্ক—সমান এক শ্রেণিভক্ত। মহাশক্তি পূর্ণ হৃদয়। ঠাকুরের উপদেশ সর্বান্তকরণে গ্রহণ করে নিজের উপলব্ধির ব্যাখ্যা করতেন তাপস লাটু। আশ্চর্যের বিষয় সবাই তাঁর কথা যুক্তিসঙ্গত মনে করে সেটি মন দিয়ে শুনতেন। অজ্ঞাতসারে স্বাভাবিকভাবে তপস্যালব্ধ অনুভূতি প্রকাশ পেত। তাঁর মুখ তখন—পথের পথিক সেও দেখে যাবে/তোমার বারতা মোর মুখ ভাবে।

দৈবায়ত্তং কুলে জন্মং/মদায়ত্তং তু পৌরুষম্। লাটু মহারাজ

যেন দেখিয়ে দিলেন উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ না করেও নিজের ওজস্বিতা অধ্যবসায়, ঐকান্তিক পরিশ্রম ও তপস্যায় মহাতাপস হওয়া যায়। অবশ্য তাঁর আধারে শক্তি দান করেছিলেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন ধ্যানশিক্ষা দেওয়া, ধ্যানের সময়ে তাপস লাটুকে লক্ষ রাখা, তাঁকে ভয় থেকে অভয় দেওয়া স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ করতেন। আমরা স্বামী সদানন্দের জুতো গুরু স্বামীজি মাথায় করে বহন করেছিলেন শুনি। স্বামীজির গুরুও একদিন কিশোর লাটুর নতুন চটির একপাটি হারিয়ে যাওয়ায় খুঁজে খুঁজে বেরিয়েছিলেন। কী ভালবাসা!

লাটু মহারাজ ছিলেন ধ্যানসিদ্ধ। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে নামের সঙ্গে নামীর ধ্যান-ধারণা করতে বলেছিলেন। কিন্তু সেই অদৃশ্য উপদেশগুলি পাওয়া যায় না। কেউই তা প্রকাশ করেননি। কিন্তু সাধক লাটুর ধ্যানময়, জপময় জীবন থেকে তা পরিস্ফুট হয়।

গীতায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ 'কিম্ প্রভায়েত কিমাসীত ব্রজেত কিম্।' স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ মূর্ত হতে দেখি লাটু মহারাজের মধ্যে।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত খুব কাছ থেকে লাটু মহারাজের এই উত্তরণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর লেখায় পাই জপ-ধ্যান তাঁর সাধনার বিশেষ অঙ্গ ছিল। রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়তেন তখন তাপস লাটু অধিক রাত্রি পর্যন্ত জপ করতেন। এমন কি এক-এক রাত্রি সকাল হয়ে যেত। এ-বিষয়ে একটি উপাখ্যান আছে। দক্ষিণেশ্বরে কিশোর লাটু সারাদিন খাটাখাটনির পর সন্ধ্যার সময়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। একদিন ঠাকুরের চোখে পড়ায় তিনি বললেন—সে কিরে? সন্ধ্যায় ঘুমুবি তো ধ্যান-ধারণা করবি কখন? ব্যস, এটিই যথেষ্ট। সেইদিন থেকে যে তিনি রাত্রে নিদ্রা ত্যাগ করলেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই অভ্যাস রক্ষা করেছিলেন। কি ঠাকুরের সঙ্গে থাকার কালে কি তাঁর দেহান্তের পর তিনি আজীবন প্রায় সারারাত জেগে ধ্যান ধারণায় কাটাতেন। এবং দুপুরে নিদ্রা যেতেন। গীতার সেই ভগবদুক্তি "যা নিশা সর্ব ভূতানাং তস্যাং জাগ্রতি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ" তাঁর জীবনে আক্ষরিক অর্থে ও বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছিল।

তাঁর চক্ষু, গাত্রবর্ণ, কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হল আজ্ঞাপ্রদ। ধীর কণ্ঠস্বর, ধীর গতি, মহেন্দ্রনাথ লিখছেন, তাপস লাটু থেকে ঋষি লাটু হলেন স্বামী অদ্ভুতানন্দ। তাঁর নরদেহ চলে গেল দেবদেহ হল। দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন সমাধির পর অর্ধবাহ্যদশায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখ থেকে দৈববাণী হয়েছিল—ওরে লেটো তোর মুখ দিয়ে বেদ-বেদান্ত ফুটে বেরোবে। তাই হয়েছিল। অনিকেত এই সাধু ভিক্ষান্নে দিনযাপন করতেন। অদোষদর্শী, প্রেমী এই সাধু সমাজের উচ্চ থেকে নিম্ন স্তরের মানুষকে বিতরণ করতেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমৃতময়ী বাণী।

লাটু মহারাজের ছিল নিরবচ্ছিন্ন জপ ও ধ্যান। ঠাকুরের অন্যান্য অন্তরঙ্গ শিষ্যদের শাস্ত্রপাঠ ছিল, সংগীত ছিল, লাটু মহারাজের ছিল একমাত্র ধ্যান, জপ, একমাত্র ঠাকুর। ঠাকুরের কৃপায় তিনি বেদান্তবিদ হলেন। শ্রদ্ধা পেলেন গিরিশবাবুর, বলরামবাবুর এমনকি সমীহ পেলেন রামচন্দ্র দত্তেরও।

রমতা সাধু ছিলেন স্বামী অদ্ভুতানন্দ। মঠে কখনও থাকেননি—নিয়মশৃঙ্খলায় বদ্ধ হবেন না বলে। বলরাম মন্দিরে একাদিক্রমে নয় বছর, কখনও বসুমতীর গুদামে থাকতেন, কখনও-বা গঙ্গার ধারে ঝোপড়িতে। ভিক্ষান্নে যাপন। যেদিন কিছুই পেতেন না সেদিন বসুমতী অফিসের সামনে চুপ করে দাঁড়াতেন। উপেনবাবু দিতেন পয়সা। প্রিয় খাবার ছিল ছোলাসেদ্ধ।

কখনও খেয়ালি, কখনও বালকবৎ অনিকেত স্বামী অদ্ভুতানন্দ কলকাতায় থাকলে গঙ্গাতীর থেকে বলরাম মন্দির ও বসুমতীতে থাকতেন—দক্ষিণেশ্বর থেকে পঞ্চকোশীর মধ্যে। কাশী ছিল তার প্রিয় স্থান। যদিও অদ্বৈত আশ্রমে একটি ঘর তাঁর নামে আছে। সেখানে তিনি থাকতেন না। কখনও পাঁড়ে হাভেলিতে কখনও হাড়ারবাগের বাড়িতে কখনও-বা গঙ্গার তীরে—গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'বিহায় কামান যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতিনিস্পৃহঃ /নির্মম নিরহংকার' তাঁর ক্ষেত্রে সত্য হয়েছিল। গীতার মূর্ত রূপ লাটু মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় পুঁথিগত বিদ্যার অনেক ঊর্ধ্বে উঠে ভগবৎ উপলব্ধিতে পরাবিদ্যার অধিকারী হয়েছিলেন। সেকালের এক পণ্ডিত বিষ্ণু তর্করত্ন বলেছিলেন, "নিরক্ষর লাটু মহারাজের মুখে ভগবদ্ তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা শুনিয়া বড়ই আনন্দ লাভ হয়, এবং সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাহাত্ম্য অবধারণ করিতে পারা যায়।" গিরিশচন্দ্রের ভাই অতুলবাবু প্রায় বলতেন, "ঠাকুরের miracle যদি দেখতে চাও, তবে লাটু মহারাজকে দেখো। এর চেয়ে বড় miracle তো আমি আর কিছু দেখিনি। মহারাজ আপনার দিকে চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের অবধি নাই।"

ছড়ামালা

দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী

মৃগাঙ্কভূষণ নিয়োগী

দুর্গা দুর্গা দুর্গা—
মহিষাসুরমর্দিনী, দশপ্রহরণধারিণী মা।
দুর্গম দৈত্যদলনী, দুর্গতিনাশিনী উমা।।

মাগো তোমারি শক্তিতে শক্তিমান আমি।
তব নাম ইষ্টনাম, জপি দিবা যামী।

মা শক্তি দাও, ভক্তি দাও, দাও আকুলতা।
বিশ্বপ্রসবিনী মাতঃ তুমি জগন্মাতা।।

নানা রূপে আরাধিতা জগৎ সংসারে।
একমেবাদ্বিতীয়ম্ মাতঃ কে বুঝিতে পারে।।

একদা দুর্ভিক্ষপীড়িত সারা ভারতবাসী।
অনাহার উৎকণ্ঠায় ছিল উপবাসী।।

মাতৃকৃপায় নানা শাকের হইল উৎপাদন।
শাকম্ভরী রূপে মাগো দিলেন দরশন।।

পুরাকালে অশ্বত্থ নিম বিল্ববৃক্ষ যত।
‘বৃক্ষরূপী দুর্গামাতা’ হতেন পূজিতা।।

দেবদেবীর সাথে বাহনেরও পূজা-আরাধনা
বৈদিক ঋষিদের তাৎপর্যপূর্ণ পরিকল্পনা।।

বিগ্রহের চালচিত্র ও চাঁদমালার ব্যবহার।
সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক ঋষিদের উদারতার।।

মঙ্গলঘটে দেবতার প্রথম আবাহন।
মঙ্গল-প্রতীক মৃন্ময়-কলসি প্রথম প্রয়োজন।।

যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবতার প্রতি প্রেমের বিস্তৃতি।
সেই অনুষ্ঠানের নাম আরতি।

প্রণামের প্রয়োজন—পূর্ণ আত্মনিবেদন।
অষ্টাঙ্গ প্রণাম সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষির বচন।।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই গদাধর
‘পাগল ঠাকুর’ নামেও তাঁকে চিনবে চরাচর।
প্রেমের ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর, কামারপুকুর ঘর
সব ছিল তাঁর অতি আপন, কেউ ছিল না পর।।

সরল কথায় বুঝিয়ে দিতেন সব ধর্মের সার
পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ দয়ার অবতার।
‘জীবের সেবাই শিবের সেবা’ এই ছিল তাঁর বাণী
মায়ের দেখা পেয়েছিলেন, আমরা সবাই জানি।

শ্রীরামকৃষ্ণের ছেলেবেলার ডাকনাম ছিল ‘গদাই’
ছোট্ট থেকেই ঈশ্বরপ্রেমে বিভোর থাকতেন সদাই।
যোগীপুরুষ তোতাপুরীর কাছে নিলেন দীক্ষা
সর্বধর্মসমন্বয়ের দিলেন তিনিই শিক্ষা।

‘যত মত, তত পথ’, ‘ঈশ্বর এক—অদ্বিতীয়’
এই বাণী আজ ঘরে-ঘরে ছোট-বড় সবার প্রিয়।
যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত
সারাজীবন ছিলেন যিনি মানবসেবায় মত্ত।

তিনিই ‘স্বামী বিবেকানন্দ’ সারা জগৎ জুড়ে
গুরুর বাণী করেছিলেন প্রচার ঘুরে-ঘুরে।
‘শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত’ শুনেই মুগ্ধ মানুষ
অজ্ঞানীরা পেয়েছিলেন খুঁজে তাদের মান-হুঁশ।

মহান গুরুর মহান শিষ্য দেশ-বিদেশের বুকে
‘রামকৃষ্ণ মিশন’ গড়ে তুললেন মহাসুখে।
ঘরে-ঘরেই ছড়িয়ে পড়ল গুরুর প্রিয় ও-নাম
‘যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ’ নিও প্রাণের প্রণাম।

মা সারদার করুণা

ডা. সুবোধকুমার ভট্টাচার্য

শ্রান্ত প্রাণে শান্তির ধারা,
এসো মা, হে সারদা।
তোমার আঁচল—আশ্রয় আমার,
দুঃখভরা হৃদয় সাড়া।

কপালে বিনয় রেখা, মুখে মধুর ভাষা,
তোমার দৃষ্টিতে জাগে করুণার আশ্বাস।
না বলেও দিলে যে শিক্ষা,
ভক্তের হৃদয় হলে তৃষ্ণা-নিরাময় পিপাসা।

রামকৃষ্ণের সঙ্গিনী তুমি,
তপস্যার মূর্তি—স্নেহময় ভূমি।
গৃহিণী রূপে যে ছিলে মাতা,
জগৎ জানে, তুমি বিশ্বজাতা।

অহংকারে নয়, নীরবে আলো,
তোমার ছোঁয়ায় অন্ধেও পায় ভালো।
তোমার পায়ে রেখেছি শির,
মা, করো না অন্তরে তিরস্কার-বাণী বহির।

তুমি নেই তবু আছো গভীরে,
ভক্তের হৃদয়ে, শ্রদ্ধার আধারে।
মা সারদা, করো আশীর্বাদ,
চিরকাল থাকি তোমার পদতলে সাধ।

আসছে যে মা

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

একটা ছড়ায় রোদ জাগা ভোর,
সুদূর নীলে হারিয়ে যাওয়া—
একটা ছড়ায় অতল দিঘির
কাজল চোখের একটু চাওয়া।

একটা ছড়ায় কাশের ঝালর
হাওয়ার ছড়ে দুলতে থাকে,
একটা ছড়ায় গন্ধ বিধুর
ছুটির আমেজ জড়িয়ে রাখে।

একটা ছড়ায় পুজোর ছুটি
ভিনদেশি লোক ফিরছে বাড়ি—
একটা ছড়ায় উড়াল মালায়,
অর্ঘ্য রচে বকের সারি।

একটা ছড়ায় শিউলি ফোটা
ফুলের হাসির আমন্ত্রণে,
ড্যাম কুড়াকুড় বাজায় ঢাকি
আসছে যে মা সবার মনে।

শরতের হাঁটা

শীতল চট্টোপাধ্যায়

সবুজ মাঠের দুয়ার দিয়ে
রেলের লাইন ধরে
হাঁটছে শরৎ শিশির সেজে
তাই তো ঘাসে ঝরে।

হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেল
মাঠের বিলের দ্বারে,
বলল—ও বিল, পদ্ম জাগাও
ছুঁতে দুর্গা মা'রে।

ওখান থেকে হেঁটে শরৎ
হাজির কাশের পাড়া,
শরৎ যেতেই কাশরা পেল
দুর্গাপুজোর নাড়া।

মাঠের ধারেই দাঁড়িয়ে শরৎ
ডাকল পুজো গানে
শরৎ গানের স্বরলিপি
জুড়ল মানুষ প্রাণে।

নিবেদিতা

মনোরঞ্জন দাস

মহান নারী যে তুমি
আদর্শের প্রতীক—
এটাই সঠিক কথা
এটাই সার্বিক।।

নারীশিক্ষার ঢেউ তুমি,
তুমি আন্দোলন—
নারীদের মনোমাঝে
তোলো আলোড়ন।।

তোমারই স্নেহস্পর্শে
কত সব নারী—
পেয়েছে মুক্তির পথ
বলি পুরোপুরি।।

তুমি জানি, জানি মোরা
এক দীপশিখা—
ছিল তোমার কর্মময়ে
নারী—ভাগ্যলিখা।।

জয় জগন্নাথ

পূর্ণাঙ্গকুমার ঘোষ

জগতের নাথ তুমি নাম জগন্নাথ
ভক্তিভরে নতশিরে করি প্রণিপাত।
যেইজন তব নাম লয় ভক্তিভরে,
তোমার কৃপায় তার সর্ব পাপ হরে।
বর্ণাশ্রম ভেদ প্রভু তব কাছে নাই,
সর্বভূতে সমদৃষ্টি সমান সবাই।
তব লীলা জগন্নাথ বোঝা বড় দায়,
শূদ্রেতে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণে তা খায়।
দ্বেষ বা বিদ্বেষ তব নাহি কারো পরে,
সমভাবে কৃপা করো সবার উপরে।
ভক্তগণ সনে তব লীলা অগণন,
ক্ষুদ্র পরিসরে তাহা না যায় বর্ণন।
ভক্তে-ভক্তে ভেদাভেদ তব কাছে নাই,
জগতের নাথ তুমি জগৎ গোঁসাই।
মনোমাঝে তব নাম হইলে উদিত,
পাপীরও হৃদি প্রভু হয় আলোকিত।
'জয় জগন্নাথ' তোমা জগজনে বলে,
সশ্রদ্ধ প্রণাম করি তব পদতলে।

আগমনীর দিনে

জগদীশ মণ্ডল

খুশির চিঠি আনবে শরৎ
ভরবে সবার মন,
চারিদিকে পড়বে সাড়া
মাতবে রে ভুবন।

এমন আশায় কোমর বাঁধি
থাকি যারা দূরে,
ফিরে আসি নিজের বাড়ি
আগমনীর সুরে।

সেই সুর শুনে জেগে ওঠে
পদ্ম, শিউলি, কাশ,
শালুক বিলে পুকুর ঝিলে
হাসে নীলাকাশ।

চিঠি পেয়ে আগমনী
বেলতলাতে আসে,
বোধন হবে নবাবগঞ্জে
ঢাকের বোল বাইপাসে।

শরৎ এল সবুজ মাঠে
হাসি কারো মুখে,
আসছে না তো ওই মেয়েটি
কষ্ট তবে বুকে!

দুর্গামাতা আসে

নিতাইচন্দ্র রজক

শরৎ মানে সবাই জানে রৌদ্রছায়ার খেলা,
নীল আকাশে হাওয়ায় ভাসে শুভ্র মেঘের ভেলা।

শরৎ মানে শিউলি ঘ্রাণে চারদিক যায় ভরে
কেয়ার ঝাড়ে নিশাস ছাড়ে গন্ধে আমোদ করে।

শরৎ মানে সবুজ ধানে মাঠগুলি যায় ভরে
ঘাসের পরে থরে থরে মুক্তো মানিক ঝরে।

শরৎ মানে জোয়ার আনে সবুজ ঘাসে ঘাসে
দ্বন্দ্ব বিভেদ মনেরই খেদ দুঃখ বিষাদ নাশে।

শরৎ মানে নদীর গানে আনে নতুন দিন
পাখির গানে শিসে তানে বাজে মনোবীণ।

শরৎ মানে ফুলের কানে অলির কথা বলা
স্বচ্ছ জলে কুলু বলে নদীর ধীরে চলা।

শরৎ মানে বাজে কানে ঢাক ও কাঁসির বোল
কচিকাঁচার গাওয়া নাচার খুশির কলরোল।

শরৎ মানে মজা দানে আনে পুজোর ছুটি
মিলেমিশে হারাই দিশে খুশি মজা লুটি।

শরৎ মানে গানে গানে কত যে সুর ভাসে
শরৎ বেলায় মিলন মেলায় দুর্গামাতা আসে।।

শুভ বিজয়া

অরূপ গুহ

দুগ্গা এল, দুগ্গা এল
এলো উৎসবের বেলা,
শহর জুড়ে চোখধাঁধানো
নানা আলোর খেলা।

দশমীতে এল মায়ের
বিদায়ের বেলা,
নিবিড় মনে, একান্তে
একটুখানি চাওয়া।

অশুভ শক্তির বিনাশ হোক,
হোক সত্যের জয়।
দয়া আসুক, শান্তি আসুক
মনে মা না থাকে যেন এই সংশয়।

মা আছেন সবখানে

কস্তুরী ত্রিবেদী

মা আসছেন মা আসছেন বলছে সবাই যখন
মা আছেন সবখানে জানতে চায় সদা সর্বক্ষণ।
এই আকাশ-বাতাস জলে-স্থলে এই মহান বিশ্বতে
সবখানেই তো তাঁরই প্রকাশ—যা আছে সৃষ্টিতে।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যে মা তুমিই করো সদা
অহংকার আর অজ্ঞানেতে ভুল ভাবি সব আমরা।
জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও আর দাও কৃপা করুণা।
যেন তোমার পূজা করে সদাই করি বন্দনা।
ব্রহ্মভাবে তুমিই তো মা ছিলে নিষ্ক্রিয়ভাবে
শক্তিরূপে সৃষ্টি তোমার এই জগতে সদা জাগে।
অসুর বিনাশে এসেছ মা তুমি এই পৃথিবীতে
হিংসা-কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-ঈর্ষা বিনাশেতে।
চণ্ডীপাঠ স্তব-স্তুতিতে আছে তোমারই স্বরূপ বর্ণনা।
চৈতন্যরূপে সবকিছুতেই তুমিই আছ করতে হবে ধারণা।
তোমার কৃপায় অজ্ঞানের কেটে যাবে সব মেঘ
জ্বলবে জ্যোতি হৃদয়মাঝে রবে না কোনো খেদ।

ঋতুর খেলা

তন্দ্রা সাঁই

রৌদ্র যখন তপ্ত বালি, তখন বুঝি গ্রীষ্ম এল
কানন যেন আম-কাঁঠালে সুবাসে তাই মন ভরালো।
বৃষ্টিধারা ধরণীতলে বর্ষা বোঝায় যেমন
তখন যেন চাতকের খুশি মনটি মাতায় তেমন।
শরৎ এলে কাশের বনে দোল জাগে যেমন
আকাশ-বাতাসে মন মাতল তেমন।
শরৎ-এর বিদায়বেলায় বিষাদের সুরে
হেমন্তের এই আগমনে ধান যে ভরে গোলা জুড়ে।
হিমেল হাওয়া বইলে বুঝি শীতের আসা
গরম পোশাক বোঝে যেন শীতের ভাষা।
বসন্ত মানে রঙের খেলা
পলাশে-শিমুলে যেন তাই রঙের মেলা।
ঋতুর খেলায় বিদায় বেলায়
রাঙিয়ে মনকে বিদায় জানাই।

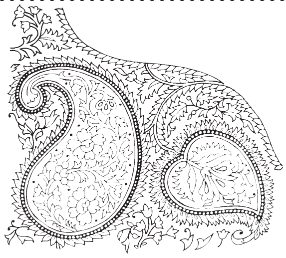

তত্ত্বমসি

চণ্ডী ঘোষ

অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে থাক বাঁধা
পথ মসৃণ থাকবে না কোনো বাধা
চোখের মণি হয়ে দৃষ্টি নজরকাড়া
হৃদস্পন্দনে সদাই পড়ছে ধরা।

সর্বধর্ম সমন্বয়—সারেগামা সাধা
যত মত তত পথ একই সুরে গাঁথা
যেমন ভাব তেমনি লাভ মূল কথা
উপলব্ধির বিষয় বোধের উপকথা।

নির্বিকার নিরাকার সর্বাত্মক সাক্ষ্যে
এই আছে এই নেই, সর্বসমক্ষে
বর্জন করতে করতে করো অর্জন—মূল কথা
জীবন প্রবক্তা তুমি, আমি শুধু শ্রোতা।

কেউ বলে সাকার কেউ নিরাকার
ভক্তভাবে দেখলে দেখা মেলে তার
জ্ঞানী বলে ব্রহ্ম নির্লিপ্ত, বর্জনই অর্জন
প্রাপ্তিযোগে ফললাভ ভজন-পূজন।

ধোঁয়ায় ঝাপসা

শঙ্করী ভৌমিক

প্রতিদিন ক্ষণে ক্ষণে—
কত কবিতা লেখা মনে মনে,
যার নেই কোনো প্রকাশ।
অদৃশ্যে উদ্ভব হয়ে—
হারায় অদৃশ্য মাঝে।

তবু সৃষ্টি মনের মণিকোঠায়
অহরহ হাজার হাজার কবিতা।
যার স্থান শুধু অন্তরালে,
বাইরের পথ না খোলায়
বদ্ধমাঝে হিরে-মুক্তোর খনি
জীবনব্যাপি থেকে যায় গোপনে।

এযে মুক্তিহীন পথে-পথে
মনের অতল সমুদ্রে তলিয়ে
শুধু বুদবুদ আকারে বাইরে।
যখন আসলের ঘটে অকালপ্রয়াণ
নকলের বেশে যা স্ফুট হয়ে হয়ে
সেও যে অমূল্য রতনে সাজানো।
যা থেকেই ধোঁয়া ধোঁয়া ভাবে কবিতা।
সে ঝাপসা ধোঁয়ায় কী যেন হাতড়ায় কবি!!

ওই নীল সাদার বেশে

তপোজিৎ মিত্র

আজও মনে পড়ে,
যেদিন প্রথম আসি মায়ের হাতটি ধরে,
বারোটা বছর কেটেই গেল,
এক বিশেষ সম্পর্কের ভিত গড়ে।।

মাঝে মাঝে ভাবি, প্রকৃতির নিয়ম যদি উল্টো হত,
দিতাম আরেকবার সম্পর্কের হাত বাড়িয়ে,
সমবেত হয়ে গাইতাম ফের,
সংগচ্ছধ্বং থেকে ওঁ সহনাববতু, প্রার্থনার লাইনে দাঁড়িয়ে।।

আমাদের যাত্রা শেষে, যাত্রা শুরু করবে এখন নবীন
তোমার দেওয়া শিক্ষা দিয়েই করব জীবনগ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলি রঙিন।।

থাকবে চিরকাল, মাথায় তোমার দেওয়া শিক্ষা,
বারোটা বছর ধরে দিলে তুমি জীবসেবার মন্ত্রে দীক্ষা।।

বিদায়বেলায় শুধু এইটুকুই বলে তোমায় যেতে চাই,
শেষ নিঃশ্বাস অবধি যেন তোমার চরণের ধুলো পাই।।

প্রণাম জানাই তোমার চরণে,
বারো বছরের দীর্ঘ অধ্যায়ের শেষে,
শূন্য থেকে ফের শুরু হবে পরের জন্মে,
এই পবিত্র নীল সাদার বেশে।।

কথা দিলাম, মনের গোপনে রাখব বাঁধিয়ে
সুখস্মৃতির পৃষ্ঠাগুলি,
ভালো থেকো আমার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন,
আজ তাহলে চলি।।

পরিচয়

দীপঙ্কর দাস

এই মেয়ে, তুই কে?
কিবা তোর পরিচয়?—
উচ্চশিরে বেড়াস ঘুরে
প্রাণে তোর নেই ভয়?

আমি সেই আদি নারী,
কিসের আমার ভয়?
তুমি জানো না? অসুর বধে
এসেছে আমার জয়?

রক্তবর্ণ চক্ষে পুরুষ
ক্রোধিত হয়ে কয়—
অবলা নারীর এত স্পর্ধা
মোটে সমীচীন নয়!

হেসে কয় আদি নারী,
মূর্খ নর, শোনো—
যুগে যুগে আমিই ফিরেছি
ভিন্ন নামে জেনো।

কখনো তোমার খেলার সাথী,
হয়েছি দিদি বা বোন—
কখনো তোমার প্রেমিকা হয়ে,
নিয়েছি তোমার মন।

আমিই তোমার শয্যা সাথী,
আজীবন প্রিয়তমা—
সবার উপরে পরিচয় মোর,
আমি জগতের মা।

তাই তো এবার দম্ভ ছেড়ে,
এ সত্যি নাও মেনে—
সমাজে আমারও আছে অধিকার
নিজেরই অসীম গুণে।।

নীতি চিরন্তন

চাণক্য নীতি

[১০৪]

২৮. স্ত্রিয়োঽপি স্ত্রৈণমবমন্যন্তে।।২৮।।

স্ত্রীগণও স্ত্রৈণ পুরুষকে অবজ্ঞা করে।

অতিশয় ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষের কামুকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে শক্তিহীনতার জন্য স্ত্রীর কাছেও অবজ্ঞাত হয়। কারণ স্ত্রীগণ দুর্বিনীত, হীনশক্তির স্ত্রৈণ পুরুষকে কখনও পছন্দ করে না।

২৯. পুষ্পার্থি নঃ সিঞ্চন্তি অদ্ভিঃ পুষ্পতরুম্।।২৯।।

পুষ্পকামী জল দিয়ে পুষ্পবৃক্ষ সেচন করে।

যে কার্যের জন্য যে দ্রব্যের প্রয়োজন সে-ই দ্রব্যই গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায় সে কার্য সিদ্ধ হয় না। যেমন দুগ্ধলাভের জন্য ধেনুর সেবা করাই উচিত, কখনোই বৃক্ষের সেবা করা উচিত নয়। সেইরূপ পুষ্পলাভের জন্য পুষ্পকামীর পুষ্পিত বৃক্ষে জলসেচন করা উচিত, অন্য বৃক্ষে সেচন করলে তার পুষ্পলাভ সম্ভব নয়।

৩০. অদ্রব্যপ্রযত্নো বালুকাপীড়নাদনন্যঃ।।৩০।।

অযোগ্য দ্রব্যের যত্ন করা বালুকা পীড়নের তুল্য।

কোনো কার্যসাধনের শুরুতেই কার্য-কারণ বিবেচনা করা উচিত। কার্য-কারণ বিবেচনা না করলে কোনো কাজের জন্য কী করা উচিত না বোঝা সম্ভব নয়। ফলে যোগ্য কাজের জন্য যোগ্য সাধনের সেবা না করে অযোগ্য সাধনের বৃথা সেবা করা হবে। শতবার চেষ্টা করেও অযোগ্য সাধনের সেবায় কার্যসাধন সম্ভব হবে না। সমস্ত চেষ্টা ও উদ্যম বালুকাপীড়নের মতোই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

৩১. ন মহাজনহাসঃ কর্ত্তব্যঃ।।৩১।।

মহাজনকে উপহাস করা উচিত নয়।

জীবনপথে চলার পাথেয়কে যেমন অবজ্ঞা করা উচিত নয়

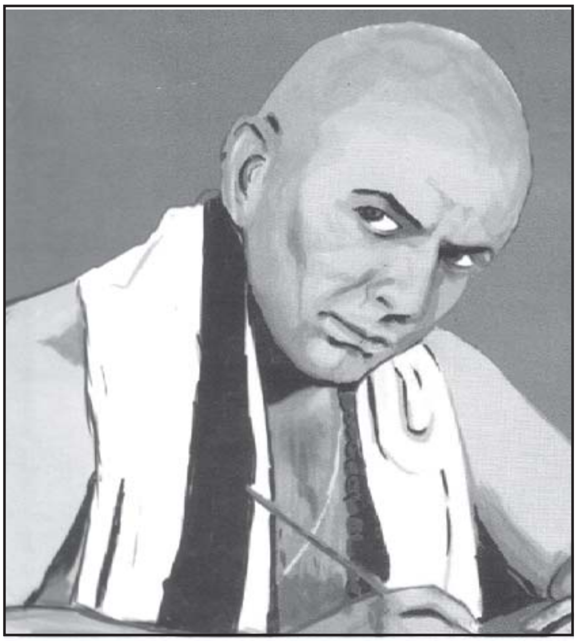

● মহামতি চাণক্য।

সেইরূপ মহান ব্যক্তিদেরও উপহাস করা উচিত নয়। গুণের সমাদরই সামাজিক উন্নতির কারণ। গুণবান মহাপুরুষদের সম্মান করলে, তাদের আদর্শকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে উন্নতি অবধারিত। সুতরাং মহাপুরুষদের অবজ্ঞা না করে তাদের আদর্শ অনুসরণ করা উচিত।

৩২. ন নর্ম্মপরীহাসঃ কর্ত্তব্যঃ।।৩২।।

মহাজনদের অবহেলা ও উপহাস করবে না।

বিদ্যা, ধর্ম, প্রতিভা ও শিষ্টাচারসম্পন্ন গুণবান মহাজন নামে পরিচিত। এরূপ ব্যক্তির জীবনাদর্শই মানুষকে অভ্যুদয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং তাঁর আদর্শকেই অনুসরণ করা উচিত, কখনও উপহাস ও অবহেলা করা উচিত নয়। অন্যথায় নিজেরই পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। **(ক্রমশ)**

শিশুমনের উন্নত মূল্যবোধ বিকাশে

বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়দের পাশাপাশি ছোটদের সাহিত্য-সৃজন যে কোনো ভাষার নিজস্ব সম্পদ। সর্বকালে, সর্বযুগে যা চিরসত্য। মহৎ লেখকের ভাবনা জুড়ে তাই ছোটরাও আলাদা জায়গা করে নেয়। শিশুদের উপযোগী সাহিত্যকর্ম যুগের পর যুগ ধরে তার নিজস্ব সৃজনশীলতায় অমরতা লাভ করে। কীর্তিনিষ্ঠ বহু লেখক তাঁদের রচনাকে এভাবেই শিশু-মনের অনুকূলে গড়ে তোলেন। আসলে এইসব যুগন্ধর স্রষ্টার দৃষ্টিজুড়ে শিশুদের কল্যাণ সাধনের দিকটা সবিশেষ নজরে থাকে। শিশুদের দেহ-মনের বিকাশ সাধনটাই সেখানে হয়ে ওঠে মূল লক্ষ্য। তাদের চিত্ত সংস্কারের দিকে মনোনিবেশের কারণেই রচিত হয় এক-একটি মূল্যবান সাহিত্যকর্ম। এইসব দুর্মূল্য গ্রন্থ সমকালের সীমা পেরিয়ে হয়ে যায় চিরকালের। প্রাচীন হয়েও নবীনতা এইসব শিশুসাহিত্যের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে যায়। অনাবিল আনন্দ, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, হরেক মজার উপচার শিশুদের সামনে উন্মোচিত হয়। পাশাপাশি থাকে সামুদ্রিক জ্ঞান ও বোধের জগৎ। নিরলস প্রচেষ্টায় এভাবেই এক-একজন মহান লেখক তাঁদের অকৃত্রিম সৃজনশীলতায় শিশুসাহিত্যের জগৎ নির্মাণ করেন। আন্তরিক দরদ দিয়েই তাঁরা মেলে ধরেন কচিকাঁচাদের অনুভূতিময় বিশ্ব। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'বর্ণপরিচয়' এমনই এক বর্ণময় অনুভবের আশ্চর্য নিবিড় রসায়ন, বস্তুত এই গ্রন্থ শিশুমনের সামনে তুলে ধরে বিচিত্র অনুভবের হাজারো কথামালা, কিশলয় মনের প্রাঙ্গণে সে ছড়িয়ে দেয় বিচিত্র কত রঙ-বেরঙের জগৎ। আসলে ছোটদের বই লেখার এক নিটোল মন বিদ্যাসাগরের ছিল। ছিল তাদের সামনে উপযুক্ত রসদ জোগানোর প্রাণঢালা প্রাচুর্য। অসামান্য মুন্সিয়ানায় ভাষা ও ভাবের আলাপনে তিনি বর্ণপরিচয় লেখেন। এ লেখা অনিবার্যভাবেই তাই মর্মসঞ্চারী হয়ে ওঠে। ফলে এই গ্রন্থ কেবল শিশুদের বর্ণগুলোকেই শুধু চেনায় না, তাদের মনকে কানায় কানায় ভরিয়ে রাখে এই বইয়ের এমনই এক অন্তর্লীন জগৎ।

২.

'বর্ণপরিচয়'-এর পাতায় পাতায় আলো ও ভালোর ছায়াছবি। শিশুমন এখান থেকেই 'হয়ে ওঠা'র মন্ত্র শিখে নেয়। বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থটি সচেতন ভাবেই নির্মাণ করেছেন। পাতায় পাতায় তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন শিক্ষার আলো। এই গ্রন্থে পাণ্ডিত্যের প্রচণ্ডতা নেই, নেই কোনো তত্ত্বের ঘনঘটা। সহজ-সরল আন্তরিকতায় লেখক শিশুদের নিয়ে যেতে চেয়েছেন অনন্ত এক নৈতিকতার জগতে। মন্দের এবড়ো-খেবড়ো, বন্ধুর ভূমি থেকে ভালোর পথ জুড়ে আমরা যেন শিশুকাল হতে হেঁটে যেতে পারি—এমনটাই বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল। বর্ণপরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ জুড়ে এই উদ্দেশ্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ছোটবেলা থেকে জীবনের রং চেনাতে শেখালেন লেখক। যে রং মানবিকতার, যে রং নীতিধর্মের, যে রং মনুষ্যত্ববোধে অন্বিত। ছোট ছোট বাক্যে লেখক এখানে গড়ে দিতে চেয়েছেন শিশুদের বোধোদয়। মনের চারাকে উষার আলোকে দেখতে চেয়েছেন তিনি। পরিবার ও সমাজের মাঝখানে শিশুদের বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠার বিষয়কেই বড় করে দেখেছিলেন বিদ্যাসাগর। মা-বাবা-বন্ধু-আত্মীয়-পরিজন-বন্ধু-বান্ধব থেকে শুরু করে স্কুলজীবনের বৃহত্তর পরিবেশে শিশুদের মনকে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন তিনি। শিশুমনের সুষ্ঠু বিকাশের দিকে বিদ্যাসাগরের সুনজর ছিল। 'বর্ণপরিচয়' এমনই এক উদার

লেখক—কবি ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক।

● দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর।

উন্মুক্ত আকাশের নিবিড় এক নক্ষত্রের আলো। মনের হরষে, প্রীতির পরশে লেখক 'বর্ণপরিচয়' লিখেছেন। তাই এই গ্রন্থ হয়ে উঠেছে নানা রঙের রামধনু—বাঙালি শিশুর প্রথম আত্মপরিচয়ের অভিজ্ঞান।

৩.

আসলে গ্রন্থটি কেবল শিশুদের বানান প্রকরণ শেখানোর কৌশল মাত্র নয়। ভাষাশিক্ষা লাভের যোগ্য উপাদান এখানে রয়েছে। ছোটদের নিয়ে ভেবেছিলেন বলেই বিদ্যাসাগর প্রচলিত নীরস ভাষাকে প্রাণবান করে গড়ে তুলেছেন। গ্রন্থের প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপন অংশে ঈশ্বরচন্দ্র লিখছেন, "বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। বহুকাল অবধি বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন, এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায়, দীর্ঘ ঋৃকার ও দীর্ঘ উ কারের প্রয়োগ নাই— এই নিমিত্ত, এই দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে।"

'বর্ণপরিচয়'-এর দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপন অংশেও লেখকের বক্তব্য ছিল—"বালকদিগের সংযুক্ত বর্ণপরিচয় এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সংযুক্ত বর্ণের উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ আছে, শিক্ষক মহাশয়েরা বালকদিগকে উহাদের বর্ণবিভাগ মাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। বর্ণবিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে, গুরু, শিষ্য, উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক, এবং শিক্ষাবিষয়েও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক।"

'বর্ণপরিচয়' এভাবেই ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে অবধারিত ভূমিকা পালন করে। বর্ণচেনা থেকে শুরু করে, শব্দ-বাক্য গঠনের পদ্ধতি জানানোর ব্যাপারে গ্রন্থটি খাঁটি শিশুসাহিত্যের সংজ্ঞায় পরিগণিত হয়ে ওঠে। ছোটদের মধ্যে শুভবোধ কিংবা নৈতিক শিক্ষা জাগানোর দায়িত্ব যথার্থ শিশু সাহিত্যিকের ধর্ম। বিদ্যাসাগর এই ধর্মপালনে ষোল আনা সফল, সন্দেহ নেই। আর এখানেই যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুশী' ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সহজপাঠ' থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' আলাদা হয়ে ওঠে। ছোটদের পাঠের উপযোগী যেমন এই গ্রন্থ, তেমনি বর্ণপরিচয় শিশুর অভিভাবকদেরও অবশ্যপাঠ্য। কথাটি একটু দৃষ্টান্ত সহকারে ব্যাখ্যা করা যাক। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের ১০ম পাঠে লেখক বিদ্যাসাগর লিখছেন—"একদা, একটি বালক বিদ্যালয় হইতে, অন্য এক বালকের একখানি পুস্তক চুরি করিয়া আনিয়াছিল। অতি শৈশবকালে ঐ বালকের পিতামাতার মৃত্যু হয়। তাহার মাসী লালন-পালন করিয়াছিলেন। তিনি, তাহার হস্তে ঐ পুস্তকখানি দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভুবন, তুমি এই পুস্তক কোথায় পাইলে। সে বলিল, বিদ্যালয়ের এক বালকের পুস্তক। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভুবন ঐ পুস্তকখানি চুরি করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু তিনি পুস্তক ফিরাইয়া দিতে বলিলেন না, এবং ভুবনের শাসন বা ভুবনকে চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না। ইহাতে ভুবনের সাহস বাড়িয়া গেল। সে যত দিন বিদ্যালয়ে ছিল, সুযোগ পাইলেই চুরি করিত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে, সে বিলক্ষণ চোর হইয়া উঠিল।"

৪.

অভিভাবকদের উদাসীনতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে অনেক সময় শিশু অপরাধী হয়ে পড়ে। বেলাগাম প্রশ্রয় সর্বনাশের চরম সীমায় পৌঁছে দেয়। গ্রন্থের দশম পাঠের শেষাংশে বিদ্যাসাগর লিখছেন—"কিছুকাল পরে, ভুবন চোর বলিয়া ধরা পড়িল ... বিচারকর্তা ভুবনের ফাঁসির আজ্ঞা দিলেন।" এরপর ভুবন রাজপুরুষবর্গকে জানায়, "তোমরা দয়া করিয়া, এ জন্মের মতো, একবার আমার মাসীর সঙ্গে দেখা করাও। ভুবনের মাসী ঐ স্থানে আনত হইলেন এবং ... তাহার নিকটে গেলেন। ভুবন বলিল, মাসী, এখন আর কাঁদিলে কি হইবে। নিকটে এস, কানে কানে তোমার একটা কথা বলিব। মাসী নিকটে গেলে পর, ভুবন তাঁহার কানের নিকটে মুখ লইয়া গেল এবং জোরে কামড়াইয়া, দাঁত দিয়া তাঁহার একটি কান কাটিয়া লইল; পরে সে ভৎর্সনা করিয়া বলিল, মাসী, তুমিই আমার এ ফাঁসির কারণ। যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানতে পারিয়াছিলে। সে সময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে, তাহা হইলে আমার এ দশা ঘটিত না। তাহা কর নাই, এজন্য এই পুরস্কার।"

বিদ্যাসাগর এভাবেই আমাদের সচেতন করে দেন। সন্তানকে সুশিক্ষা দিতে প্রকারান্তরে অভিভাবককেই দায়িত্ববান হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে নজর দিতে চেয়েছেন। 'বর্ণপরিচয়'-এর এই ১০ম পাঠটিকে প্রথম মৌলিক গল্প হিসাবেও দেখা যেতে পারে। আজকের নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে বাচ্চারা অভিভাবকদের কাছ থেকে বহুলাংশে আবদারটাই পেয়ে যায়। বাচ্চাকে শাসন করার ক্ষেত্রটা অনেক ক্ষেত্রে কমে আসছে। আর ঠিক এইখানেই বিদ্যাসাগর আমাদের সকলকে যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করার কথা বলে যান। প্রসঙ্গত মহামানবের ছড়ায় আছে,

“ভুল করে যে খায়নি ধমক
পায়নি কোনো লাঞ্ছনা
ভুল তাহারে ভুলিয়ে নিয়ে
করেই জ্ঞানে বঞ্চনা।”

শিশুদের আদরটা কখন দিতে হবে আবার কখন তাদের ‘কানমলা’ দিতে হবে, এটা সঠিক সময়ে অভিভাবকদের জানা দরকার বলে ‘বর্ণপরিচয়’ গ্রন্থ কেবল শিশুদের কাছে নয়, বড়দেরও শিক্ষণীয় পাঠ্যবই হয়ে ওঠে। এই বই বড়দেরকেও ভাবতে শেখায়। ভুবনের কথা মনে পড়লে নড়বড়ে সাঁকো দিয়ে পথ চলার বিপদ এড়িয়ে চলতে পারি। গোলমেলে নামতার ধারাপাতে জীবনের অঙ্কটা যেন গুলিয়ে না ফেলি।

৫.

‘বর্ণপরিচয়’ গ্রন্থে শিশু চরিত্রের উদ্‌ঘাটন লক্ষ্যণীয়। গ্রন্থের গোপাল, রাখাল, যাদব, মাধব, ভুবন, সুরেন্দ্র, নবীন—এইসব চরিত্রেরা কোথাও না কোথাও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বলাই’, ‘তারাপদ’, ‘অমল’ কিংবা ‘ফটিক’ হয়ে ওঠে যেন বা। ভালো-মন্দের বাতাবরণেই গল্পের নির্মাণ। যেখানে গল্পের প্লট, চরিত্র রচনা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থে ছোটগল্পের আভাস ফুটিয়ে তুলেছেন। বলতে দ্বিধা নেই, বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের সারল্যে যে রাজরথ বিশ্ববিজয় করেছিল, তার পথ প্রস্তুত করেছিলেন বিদ্যাসাগর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ‘বর্ণপরিচয়’ অনেক ক্ষেত্রেই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। সংযুক্ত বর্ণ ও অসংযুক্ত বর্ণ পাঠ করতে বসে শিশুমন যেন এক ছন্দের মুখোমুখি হয়। ‘ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য’-এর ঝঙ্কার শোনে। দ্বিতীয় ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠ শিশুকে আদর্শ মনুষ্যত্বের সন্ধানে ব্রতী করে। ‘কখনও কাহাকেও কুবাক্য বলিও না’, ‘কখনও কাহারও সহিত কলহ করিও না।’ —এসব তো জীবনর পথে চলার মূলধন।

বিদ্যাসাগর শিখিয়ে দিলেন শিশুদের সত্যের শিক্ষা, মিথ্যা আচরণের প্রতি ঘৃণা—‘কখনও মিছা কথা কহিও না’, ‘কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না’ ইত্যাদি। ‘বর্ণপরিচয়’-এর পঞ্চম পাঠ (দ্বিতীয় ভাগ)-এ নবীনের আত্মোন্নতি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ন’ বছরের নবীন যখন ভাবে “আমি যদি, লেখাপড়ার সময়, লেখাপড়া না করিয়া, কেবল খেলিয়া বেড়াই, তাহা হইলে, আমি চিরকাল দুঃখ পাইব।” তখন তার আত্মবিশ্লেষণ যেন সকলের কাছে উজ্জ্বল পরিচায়ক হয়ে ওঠে। আসলে তাদের শুভবোধ ও নৈতিক শিক্ষাদানের বিষয়টি প্রধান ছিল বলেই বিদ্যাসাগর শিশুসাহিত্যে বড় আপনার হয়ে ওঠেন। বস্তুত শিশুসাহিত্যকে কেন্দ্র করে বিদ্যাসাগরের ভাবনার বিস্তৃতি ও প্রসার এক ঐতিহাসিক অধ্যায়।

৬.

বাংলা গদ্যের শব্দপ্রয়োগে, পদবিন্যাস গঠনে, বাক্য গঠন ও ধ্বনিসংগীত সৃজনে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব তুলনারহিত। পূর্বের বাংলা ভাষায় যে সমাসের আড়ম্বরপূর্ণ ছিল বিদ্যাসাগর তাকে মুক্ত করে বাংলা গদ্যের সৌন্দর্য বাড়িয়েছেন। সৌম্য ও সরল শব্দ চয়ন করে তাঁর বাংলা রচনা শিশুশিক্ষার পক্ষেও সহায়ক ও শুভ ছিল। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত ‘বর্ণপরিচয়’ গ্রন্থে কর্তা কর্ম ক্রিয়াপদের যথাযথ অন্বয় পরিলক্ষিত হয়। বাংলা লেখায় কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি ইত্যাদি ছেদচিহ্নের প্রবর্তন করেছেন বিদ্যাসাগর। এক্ষেত্রে ‘বর্ণপরিচয়’-এরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সঠিক স্থানে বিরাম চিহ্নের প্রয়োগ যে গদ্যকে ধ্বনিসংগীতময় করে তোলে, ‘বর্ণপরিচয়’ গ্রন্থে তার পরিচয় মেলে। এই গ্রন্থটির হাত ধরেই বিদ্যাসাগর গদ্যের বহিরঙ্গে সুষমা, সৌন্দর্য ও অন্তরঙ্গে তার লাবণ্য ও রমণীয়তাকে নিয়ে আসেন। সুতরাং বলা যায়, বাংলা গদ্যে ‘বর্ণপরিচয়’ অতুলনীয় এক নিদর্শন। কেবল ‘Text book writer’ বলে বিদ্যাসাগরের প্রতিভাকে ছোট করার চেষ্টা সেইসময় অনেকে করেছেন, তবু এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম ‘বর্ণপরিচয়’ রচনা না করলে, বাংলা গদ্যকে শিল্পগুণান্বিত করে না তুললে, বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাষাকে আশ্রয় করে মানবজীবনের সৌন্দর্যরূপ দিতে পারতেন না। এই ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের গদ্যচর্চার সঠিক মূল্যায়ন করা যেতে পারে, ‘বর্ণপরিচয়’ গ্রন্থ সম্পর্কেও ঠিক একথা বলা যায়।

বিপ্লবী যুগের অগ্নিকন্যা

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

অনুপ দাস

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। মাস্টারদা সূর্য সেনের কাছে পেয়েছিলেন বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা। মাস্টারদার সুযোগ্য শিষ্যারূপে একদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কর্মযজ্ঞে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অসীম সাহস ও নিষ্ঠা। দেশ উদ্ধারের কাজে বাজি রেখেছিলেন নিজের অমূল্য প্রাণ।

ছয় ভাইবোনের মধ্যে প্রীতিলতা ছিলেন মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান। ১৯১১ সালের ৫ই মে মঙ্গলবার বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামের ধলঘাট গ্রামে এক বৈদ্য ব্রাহ্মণ ঘরে তাঁর জন্ম হয়। পিতা জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দেদার ও মাতা প্রতিভাদেবীর সাংসারিক জীবনযাপন ছিল খুব সাধারণ আর পাঁচটি গ্রাম্য পরিবারের মতো। জগদ্বন্ধুবাবুদের আদি পদবি ছিল দাশগুপ্ত। নবাবি আমলে কোনো পূর্বপুরুষ লাভ করেছিলেন 'ওয়েহেদেদার' উপাধি। পরে তা পরিবর্তিত হয়ে হয়েছিল ওয়াদ্দেদার বা ওয়েদ্দার। জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দেদার ছিলেন মিউনিসিপ্যাল অফিসের হেড কেরানি। চট্টগ্রামের ডেঙাপাড়ার পৈতৃক ভিটা ছেড়ে চলে আসেন ধলঘাট গ্রামে। ধলঘাটের বাড়িতে জন্ম হয় প্রীতিলতার। মা প্রতিভাদেবী মেয়ের নাম রেখেছিলেন 'রানি'। প্রীতিলতার শৈশবকালে পিতা জগদ্বন্ধু চট্টগ্রাম শহরের আসগার খাঁর দীঘির পাড়ে বানিয়েছিলেন টিনের ছাউনির মাটির দোতলা বাড়ি। শিশু বয়সে প্রীতিলতা ছিলেন লাজুক প্রকৃতির, কম কথা বলতেন, সাহায্য করতেন মায়ের কাজে। এরপর শুরু হয় প্রীতিলতার স্কুল জীবন। ভর্তি হন ডা. খাস্তগির সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে। স্কুলে ভর্তি হয়ে প্রথম থেকে তিনি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নজর কাড়েন। প্রতিটি ক্লাসে অত্যন্ত ভাল ফলাফল করে উত্তীর্ণ হন একের পর এক ক্লাস। তাঁর এই রেজাল্টের জন্য সব শিক্ষকদের প্রিয় ছিলেন প্রীতিলতা। ভালবাসতেন ইতিহাসের শিক্ষিকা উষাদি। প্রীতিলতার চোখে যেন দেখেছিলেন নতুন ভোরের স্বপ্ন। তিনি প্রীতিলতাকে শোনাতেন ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাইয়ের গল্প। শোনাতেন পুরুষের বেশে কীভাবে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন রানি লক্ষ্মীবাঈ। স্কুলে প্রীতিলতার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল আর এক অসম সাহসিনী নারী বিপ্লবী কল্পনা দত্তের সঙ্গে। কল্পনা দত্ত তাঁর লেখনীতে বলেছেন, '... ঝাঁসীর রানি আমাদের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে। নিজেদেরকে আমরা অকুতোভয় বিপ্লবী হিসাবে দেখা শুরু করলাম।'

লেখক—বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গ্রন্থকার।

প্রীতিলতার স্কুলে প্রিয় বিষয় ছিল আর্টস এবং সাহিত্য। ১৯২৬ সালে তিনি বৃত্তি পান সংস্কৃত ব্যাকরণে। ১৯২৮ সালে প্রথম বিভাগে পাশ করেন ম্যাট্রিক পরীক্ষা। আসে বিয়ের প্রস্তাব। এক কথায় নাকচ করেন সেই অনভিপ্রেত প্রসঙ্গ। সামনে যে অনেক বড় কাজ তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। পড়াশুনার মধ্যে প্রাণ ঢেলে দেন প্রীতিলতা। আই.এ. পড়ার জন্য ভর্তি হন ঢাকার ইডেন কলেজে। ঢাকার ইডেন কলেজের ছাত্রীনিবাসে থেকে চলতে থাকে তাঁর পড়াশুনা। ১৯৩০ সালে আই.এ. পরীক্ষায় প্রীতিলতা মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সকল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল পঞ্চম। তাঁর এই সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০ টাকা করে মাসিক বৃত্তি পান। বি.এ. পড়তে ভর্তি হন কলকাতার বেথুন কলেজে। প্রীতিলতা ভাল বাঁশি বাজাতে পারতেন। সতীর্থরা অবসর সময়ে বসে শুনতেন প্রীতিলতার বাঁশির সুর। প্রীতিলতা সেইসময় সম্পূর্ণভাবে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। খুব গোপনে চলত অনুশীলন সমিতির সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ। মনের মধ্যে তখন জ্বলছে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আগুন। পড়াশুনার কঠোর

● অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা।

সাধনায় কিছুটা তাল কাটে। ১৯৩২ সালে বেথুন কলেজ থেকে ডিসটিংশান নিয়ে বি.এ. পাশ করেন।

স্কুলজীবন থেকে পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের কার্যধারা, আদর্শ তাকে অনুপ্রাণিত করত। লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তেন 'দেশের কথা', বাঘা যতীন, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল সবার জীবনী। ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স নামে এক আইন পাশ করে, যার সাহায্যে বিনা বিচারে বিপ্লবীদের আটক করা শুরু হয়। সেই আইনে চট্টগ্রামের বেশ কিছু নেতা ও কর্মী আটক হন। বিপ্লবীদের প্রকাশনা ইত্যাদির উপর বিধিনিষেধ চাপানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত করা হয় কাগজপত্র।

বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র ও সদস্যরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র কাগজপত্র বই ইত্যাদি গোপনে নিকট আত্মীয়স্বজনের কাছে সরিয়ে ফেলে। কারণ ধরা পড়লেই হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে নিয়ে যাবে জেলখানায়। বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রীতিলতার এক দাদা পূর্ণেন্দু দস্তিদার। তাঁর অনুপ্রেরণা অল্পবয়সে প্রীতিলতাকে বিপ্লবের পথে এগুতে সাহায্য করেছিল। সেইসময় বিপ্লবী দলে মহিলাদের সদস্য করা হত না। অতি নিকট আত্মীয় ছাড়া বিপ্লবীদের মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশা নিষিদ্ধ ছিল। ঢাকায় পড়াশুনার সময় প্রীতিলতা লীলা নাগের সঙ্গে পরিচিত হন যিনি দীপালী সংঘ নামে একটি মহিলা সংগঠন পরিচালনা করতেন। বিয়ের পর তিনি লীলা রায় নামে পরিচিত হন। সেখানেও গোপনে মেয়েদের মধ্যে বৈপ্লবিক সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আলোচনা ও বক্তব্য রাখা হত। সেখানে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা ইত্যাদির প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন প্রীতিলতা। মাস্টার সূর্য সেনের নাম তখন চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে আলোচিত। বিপ্লবীদের চোখে তিনি ঈশ্বরস্বরূপ। তাঁর নির্দেশ পেলে যে কোনো কাজে বিপ্লবীরা প্রাণ বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। প্রীতিলতার স্বপ্ন ছিল মাস্টারদা সূর্য সেনের পদতলে বসে স্বাধীনতা সংগ্রামের পাঠ নেওয়া। মনে মনে নিজেকে একজন প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করে গেছেন। নিষ্ঠার কোনো অভাব ছিল না। লিখে রেখে গেছেন মনের কথা। "আই.এ. পড়ার জন্য ঢাকায় দু' বছর থাকার সময় আমি নিজেকে মহান মাস্টারদার একজন উপযুক্ত কমরেড হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়েছি।"

১৯২৯ সালের মে মাসে সূর্য সেনের সম্মতিতে চট্টগ্রামে জেলা কংগ্রেসে প্রথম আয়োজিত হয় নারী সম্মেলন। সভাপতিত্ব করেন কংগ্রেস নেত্রী লতিকা বোস। সেই সভার আয়োজনে পূর্ণেন্দু দস্তিদার বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রীতিলতা এবং কল্পনা দত্ত। ইচ্ছে ছিল এই সুযোগে মাস্টারদার সাক্ষাৎলাভ করা। সেই সম্মেলনে পূরণ হয়নি তাঁদের আন্তরিক অভিলাষ। ১৯৩০ সালের ১৯শে এপ্রিল সংঘটিত হয় 'চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ'। ধ্বংস হয় রেললাইন, টেলিফোন অফিস, চট্টগ্রামের পুলিশ লাইন এবং লুণ্ঠিত হয় ব্রিটিশ অস্ত্রাগার। সারা দেশ জুড়ে খবর হয় চট্টগ্রামে মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীদের এই কর্মকাণ্ডের। পরাধীন ভারতের ছাত্র ও যুবসমাজ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে সেই সংবাদে। সেই প্রসঙ্গে প্রীতিলতা যা লিখেছিলেন তা এইরূপ, "পরীক্ষার পর ঐ বছরেরই ১৯ এপ্রিল সকালে বাড়ি ফিরে আমি আগের রাতে চট্টগ্রামের বীর যোদ্ধাদের মহান কার্যকলাপের সংবাদ পাই। ঐ সব বীরদের জন্য আমার হৃদয় গভীর শ্রদ্ধায় আপ্লুত হল। কিন্তু ঐ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে না পেরে এবং নাম শোনার পর থেকেই যে মাস্টারদাকে শ্রদ্ধা করেছি তাঁকে একটু দেখতে না পেয়ে আমি বেদনাহত হলাম।"

ছাত্রী অবস্থাতেই বিপ্লবের পথে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মন-প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন প্রীতিলতা। শুরু হয় তাঁর কলকাতায় বেথুন কলেজে পড়াশুনা। ১৯৩০ সাল। দাদা পূর্ণেন্দু দস্তিদার যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন। যুব বিদ্রোহের পর তাঁকেও গা ঢাকা দিতে হয়। থাকতেন মনোরঞ্জন রায়ের পিসির বাড়ি। প্রীতিলতা মাঝেমধ্যে চলে আসতেন দাদার সঙ্গে দেখা করার জন্য। হঠাৎ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন পূর্ণেন্দু। প্রীতিলতা প্রেসিডেন্সি কলেজের কেমিস্ট্রির ছাত্র মনোরঞ্জন রায়ের সান্নিধ্যে আসেন। সেইসময় মাস্টার মনোরঞ্জনের উপর বেশ কিছু দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যার মধ্যে ছিল নারীদের বিপ্লবের কাজে যুক্ত করা। মনোরঞ্জনের উপর গান কটন ও বোমা তৈরির মতো গুরুদায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল। মনোরঞ্জনের পিসির বাড়িতে বৈঠকে মিলিত হতেন প্রীতিলতা, রেণুকা রায়, কল্পনা দত্ত, কমলা চ্যাটার্জি প্রমুখেরা। এঁরাই গোপনে মাস্টারদার প্রেরিত ইস্তেহার বিতরণ করতেন কলকাতার নানা স্থানে। মনোরঞ্জন চিনেছিলেন প্রীতিলতাকে, বিপ্লবের কাজে জীবনের ঝুঁকি নিতে কখনও সে পিছপা হবে না। প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্তের উপর বেশ কিছু দায়িত্বভার দিয়ে মনোরঞ্জন চট্টগ্রাম যান মাস্টারদার কাছে তাঁর নির্দেশমতো কয়েকটি বোমা পৌঁছে দিতে। কাজ সেরে কলকাতা ফিরতে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন মনোরঞ্জন।

অন্যদিকে ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ টি জে ক্রেগ আসেন চট্টগ্রাম সফরে। তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তীর উপর সেই দায়িত্ব অর্পণ করেন মাস্টারদা। ১৯৩০ সালের ২রা ডিসেম্বর চাঁদপুর রেলস্টেশনে প্রয়োজনীয় অস্ত্রসমেত উপস্থিত হন রামকৃষ্ণ ও কালীপদ। লক্ষ্য ক্রেগ। কিন্তু তারা ভুলবশত ওভারকোট পরিহিত চাঁদপুরের এসডিও তারিণী মুখার্জির উপর গুলি চালান। ক্রেগ সাহেবের বদলে কাকে হত্যা করলেন তা বোঝার আগে ধরা পড়েন দুজনে। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। কালীপদ চক্রবর্তীকে দেওয়া হয় নির্বাসন দণ্ড। কলকাতার আলিপুর জেলে পাঠানো হয় রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে। এই সময় প্রীতিলতার কাছে গোপন নির্দেশ আসে আলিপুর জেলে রামকৃষ্ণের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য। প্রীতিলতা বেথুন কলেজে বি.এ. ক্লাসের ছাত্রী। অকুতোভয় প্রীতিলতা সেই নির্দেশ সানন্দে গ্রহণ করেন। মৃত্যুপথযাত্রী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করার জন্য 'কাজিন' পরিচয় দিয়ে ছদ্মনামে দরখাস্ত জমা করেছিলেন আলিপুর জেল কর্তৃপক্ষের কাছে। প্রীতিলতা, অমিতা দাস ছদ্মনামে যেতেন রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে। মানুষটার সঙ্গে দেখা করে সেই সংবাদ চট্টগ্রামে তাঁর আত্মীয়-পরিজনের কাছে প্রেরণ করা ছিল প্রীতিলতার মূল কাজ। প্রায় চল্লিশবার আলিপুর জেলে গিয়ে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খবর নিতেন প্রীতিলতা। সেই সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রীতিলতা লিখেছেন, 'তাঁর গাম্ভীর্যপূর্ণ চাউনি, খোলামেলা কথাবার্তা, নিঃশঙ্ক চিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা, ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি, শিশুসুলভ সারল্য, দরদী মন এবং প্রগাঢ় উপলব্ধিবোধ আমার উপর গভীর রেখাপাত করল। আগের তুলনায় আমি দশগুণ বেশি কর্মতৎপর হয়ে উঠলাম। আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত এই স্বদেশপ্রেমী যুবকের সঙ্গে যোগাযোগ আমার জীবনের পরিপূর্ণতাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল।'

১৯৩১ সালের ৪ঠা আগস্ট আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি হয় রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের। প্রীতিলতা লেখেন, 'রামকৃষ্ণদার ফাঁসির পর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সরাসরি যুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা আমার অনেক বেড়ে গেল।' প্রীতিলতা ক্রমশ অস্থির হয়ে ওঠেন মাস্টারদার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। কিন্তু তখনও বি.এ. ফাইনাল পরীক্ষার বেশ কিছু মাস বাকি। পরীক্ষা শেষ হতে কলকাতার পাট চুকিয়ে ফিরে আসেন চট্টগ্রাম, যার মুখ্য উদ্দেশ্য মাস্টারদা সূর্য সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। প্রীতিলতা লিখেছেন, '১৯৩২ সালে বি.এ. পরীক্ষার পর মাস্টারদার সাথে দেখা করবই এই প্রত্যয় নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।' চট্টগ্রামে ফিরে দেখেন পিতা জগদ্বন্ধুবাবুর চাকরি চলে গেছে। সংসারে চলছে তীব্র অর্থকষ্ট। সংসারের দায়িত্ব বেড়ে যায় প্রীতিলতার। বি.এ.-তে ডিসটিংশান নিয়ে পাসের সুবাদে চট্টগ্রামের তৎকালীন নন্দনকানন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধানশিক্ষিকার পদে নিযুক্তি পান। স্কুলের চাকরির সঙ্গে সঙ্গে প্রাইভেট টিউশনের মাধ্যমে প্রীতিলতা সংসারের হাল ফেরাতে সচেষ্ট হন।

ইতিমধ্যে কল্পনা দত্ত কলকাতা থেকে এসে বি.এসসি পড়ার জন্য ভর্তি হন চট্টগ্রাম কলেজে। বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের ছেদ পড়েনি। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে পরেই মাস্টারদা ইংরেজ শাসকের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করেন। সেই গোপন ডেরা থেকে চলছিল তাঁর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড। সেই সময় ইংরেজ সরকার মাস্টারদার মাথার মূল্য ঘোষণা করেছিল ১০০০০ টাকা। একদিন গোপন ডেরায় মাস্টারদার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে কল্পনা দত্তের। মাস্টারদাকে জানান তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রীতিলতা বিশেষভাবে আগ্রহী। অজ্ঞাতবাসকালে মাস্টারদার অন্যতম সঙ্গী ছিলেন বিপ্লবী নির্মল সেন। কল্পনা দত্ত একদিন রাতে একটি গোপন স্থানে প্রীতিলতার সঙ্গে পরিচয় করান নির্মল সেনের। নির্মল সেন প্রীতিলতার কাছে জানতে চান পরিবারের প্রতি তাঁর কেমন টান। উত্তরে প্রীতিলতা বলেন, 'টান আছে। কিন্তু ডিউটি টু ফ্যামিলিকে ডিউটি টু কান্ট্রির কাছে বলি দিতে পারব।' নির্মল সেন সেদিন আঁচ পেয়েছিলেন রানি তথা প্রীতিলতার মধ্যেকার আগুনের। প্রীতিলতাকে তিনি কথা দেন শীঘ্রই মাস্টারদার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবেন। প্রীতিলতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা উঠে এসেছে মাস্টারদার কলমে। তিনি লিখেছেন, 'তার চোখেমুখে একটা আনন্দের আভাস দেখলাম। এতদূর পথ হেঁটে এসেছে, তার জন্য তার চেহারায় ক্লান্তির কোনো চিহ্নই লক্ষ করলাম না। যে আনন্দের আভা তার চোখেমুখে দেখলাম, তার মধ্যে আতিশয্য নেই, Fickleness নেই, Sincerity শ্রদ্ধার ভাব তার মধ্যে ফুটে উঠেছে। একজন উচ্চশিক্ষিত cultured lady একটি পর্ণকুটিরের মধ্যে আমার সামনে এসে আমাকে প্রণাম করে উঠে বিনীতভাবে আমার দিকে দাঁড়িয়ে রইল, মাথায় হাত দিয়ে নীরবে তাকে আশীর্বাদ করলাম ..." সেদিন প্রায় ঘণ্টা দুয়েক নানা বিষয়ে মাস্টারদার সঙ্গে আলোচনা হয় প্রীতিলতার। প্রীতিলতা নেমে পড়েন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে।

মাস্টারদার কাছে অকপটে জানায় তাঁর অ্যাকশনে আগ্রহের কথা। একদিন গোপন আস্তানা থেকে প্রীতিলতাকে ডেকে পাঠান মাস্টারদা। চট্টগ্রামের ধলঘাট গ্রামে সাবিত্রীদেবীর মাটির দোতলা বাড়ি ছিল সেই গোপন ডেরা। বিপ্লবীরা ওই স্থানের নাম রেখেছিলেন 'আশ্রম'। সাবিত্রীদেবী তাঁর এক পুত্র ও বিবাহিতা কন্যাকে নিয়ে সেই বাড়িতে বসবাস করতেন। সেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপ্লবীরা এসে দেখা করতেন মাস্টারদার সঙ্গে। চলত আলোচনা, নানা বৈপ্লবিক কাজকর্মের পরিকল্পনা। সর্বক্ষেত্রে বজায় রাখা হত সার্বিক গোপনীয়তা। প্রীতিলতাও অতি গোপনে আশ্রমে এসে পৌঁছান। মাস্টারদার প্রেরিত একজন বিপ্লবী সেখানে নিয়ে আসেন রানি তথা প্রীতিলতাকে। মাস্টারদার নির্দেশে প্রীতিলতাকে পিস্তল চালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মাস্টারদা বোঝান দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের ভূমিকা ও কর্তব্য। প্রীতিলতা মুগ্ধ হয়ে শুনতেন মাস্টারদার কথা। সেইসময় ইংরেজ শাসক সূর্য সেনকে ধরার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। মাস্টারদার অবস্থান টের পায় পুলিশ। প্রীতিলতা আশ্রমে আসার দুদিন পর অর্থাৎ ১৯৩২ সালের ১৩ই জুন রাতে পুলিশ হাজির হয় আশ্রমে। পটিয়া পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ ক্যাপ্টেন ক্যামেরন বিশাল দল নিয়ে আশ্রম ঘিরে ফেলে। সেই সময় মাস্টারদা খেতে বসেছিলেন। পুলিশের পদধ্বনি বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয় না। মুহূর্তে ঘরের ভিতরে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে নির্মল সেনকে বলেন, 'নির্মলবাবু পুলিশ এসেছে।' প্রীতিলতাকে বলেন, সাবিত্রীদেবীদের সঙ্গে থাকতে। 'ঘরে কে আছে?' হুঙ্কার দিয়ে পুলিশ ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ফেলে। সাবিত্রীদেবী ও তাঁর ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কাউকে তারা দেখতে পায় না। হঠাৎ শুনতে পায় মাটির ঘরের দোতলায় পায়ের আওয়াজ। তৎক্ষণাৎ ক্যাপ্টেন ক্যামেরন রিভলবার উঁচিয়ে দোতলায় উঠে যায়। দোতলার দরজায় ধাক্কা দিতে নির্মল সেনের পিস্তল গর্জে ওঠে। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ক্যামেরন। শুরু হয় পুলিশের পাল্টা গুলিবর্ষণ। গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন নির্মল সেন। এদিকে মাস্টারদা প্রীতিলতা ও অপূর্ব সেনকে নিয়ে দ্রুত অন্ধকারে গা ঢাকা দেন। তার মধ্যে পুলিশের গুলি এসে বিদ্ধ করে অপূর্ব সেনকে। মৃত অপূর্ব সেনকে রেখে প্রীতিলতাকে নিয়ে ডুব দেন পানাপুকুরে। সেই গভীর অন্ধকার রাতে সাঁতরে পুকুর পেরিয়ে উপস্থিত হন পটিয়ার কাশীয়াইশ গ্রামে মণিলাল দত্তের বাড়ি। মণিলাল বিপ্লবী দলের সদস্য। মাস্টারদা তখন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করছেন। অনেক পথ পেরিয়ে মণিলাল তাদের নিয়ে আসে জ্যৈষ্ঠপুরা গ্রামে। গ্রামের একপাশে বিপ্লবীদের গোপন আশ্রয়স্থল, যা ছিল 'কুটির' নামে পরিচিত। সেখানে পৌঁছে কিছুটা স্বস্তির শ্বাস ফেলেন মাস্টারদা। প্রীতিলতা যেন এই বিপ্লবের স্বপ্নই দেখছিলেন এতদিন। কুটিরে তখন আত্মগোপন করেছিলেন কালীকিঙ্কর দে, মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে। মাস্টারদাকে পেয়ে তাঁরা যেন নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। প্রীতিলতাকে বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ দেন সূর্য সেন। প্রীতিলতা চিন্তিত হন তাঁর হাতে লেখা বেশ কিছু কাগজপত্র পুকুর পেরুনোর সময় হারিয়ে যাওয়াতে সূর্য সেন মণিলালকে পাঠিয়ে খোঁজ নেন প্রীতিলতার উপর পুলিশের কোনো নজরদারি চলছে কিনা। মণিলালের কাছ থেকে সদুত্তর পেয়ে প্রীতিলতা পুনরায় স্কুলের কাজে যোগদান করেন।

১৯৩২ সালের ১৫ই জুন আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, 'এইমাত্র সংবাদ আসিয়াছে যে গত রাত্রে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ার নিকটে বিপ্লবী ও সৈন্যদের এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ফলে গুর্খা বাহিনীর ক্যাপ্টেন ক্যামেরন ও দুইজন বিপ্লবী নিহত হইয়াছেন। বিপ্লবীদের নিকট দুইটি রিভলবার ও গুলি ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। নিহত বিপ্লবীদের একজনকে নির্মল সেন বলিয়া শনাক্ত করা হইয়াছে।'

বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য গ্রেফতার হন সাবিত্রী দেবী ও তাঁর পুত্র-কন্যা। পরে তাদের চার বছর কারাবাস হয়। সারা বাড়ি এবং আশপাশের বনজঙ্গল পুকুর সব জায়গায় তন্নতন্ন করে চালানো হয় তল্লাশি। তল্লাশিতে পাওয়া যায় রিভলবার, বইয়ের পাণ্ডুলিপি, বেশ কিছু চিঠি, কাগজপত্র, রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের দুটো ছবি এবং দুটো মেয়েদের ছবি, যার একটি ছিল প্রীতিলতার। পাওয়া যায় প্রীতিলতার হাতে লেখা সেন্ট্রাল জেলে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে অমিতা দাশ ছদ্মনামে দিনের পর দিন তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণ। পুলিশ তদন্তে নামে। হাতের লেখা মেলানোর জন্য প্রীতিলতার বাড়ি থেকে নিয়ে যায় তাঁর গানের খাতা। মাস্টারদার কাছে সেই খবর যেতে তিনি প্রীতিলতাকে আত্মগোপনের নির্দেশ দেন। ১৯৩২ সালের ৫ই জুলাই প্রীতিলতা ছাত্রী পড়ানোর কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। মাস্টারদার পরিকল্পনা অনুসারে মণিলাল দত্ত এবং বীরেশ্বর রায় প্রীতিলতাকে ঘোড়ার গাড়িতে করে নিয়ে যান বিপ্লবীদের এক গোপন আস্তানায়। মেয়ে বাড়ি না ফেরায় অস্থির হয়ে পড়েন পিতা জগদ্বন্ধু। চারিদিকে খোঁজখবর করে কোথাও মেয়ের সন্ধান না

পেয়ে শেষে স্থানীয় থানার শরণাপন্ন হন। প্রীতিলতার অন্তর্ধানের বিষয়ে তাঁর বান্ধবী কল্পনা দত্তের বাড়িতে গিয়ে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে। সে প্রসঙ্গে কল্পনা দত্ত লিখেছেন, 'আমাদের বাসায় এসে গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর বলে : এত শান্তশিষ্ট নম্র মেয়ে ও এত সুন্দর করে কথা বলতে পারে, ভাবতেও পারি না তার ভিতর এত কিছু আছে! আমাদের খুব ফাঁকি দিয়ে সে পালিয়ে গেল।'

এদিকে চট্টগ্রামের গোপন ডেরা থেকে ক'দিন পর প্রীতিলতাকে নিয়ে যাওয়া হয় পড়ৈকড়া গ্রামে রমণী চক্রবর্তীর বাড়ি। সেই বাড়িতে অতি গোপনে দিন কয়েক কাটিয়ে আসেন বিপ্লবীদের আরেক আস্তানায়। বিপ্লবীদের কাছে সেই বাড়ি 'কুন্তলা' নামে পরিচিত ছিল। সেখানে তখন ছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন এবং তারকেশ্বর দস্তিদার।

প্রীতিলতার আত্মগোপনের খবরে আলোড়িত হয় চট্টগ্রাম। ১৩ই জুলাই ১৯৩২ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় প্রীতিলতার আত্মগোপনের খবর। শিরোনাম দেওয়া হয় 'চট্টগ্রামের পলাতকা'। লেখা হয়, 'চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার ধলঘাটের শ্রীমতী প্রীতি ওয়েদ্দাদার গত ৫ই জুলাই, মঙ্গলবার চট্টগ্রাম শহর হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর। পুলিশ তাঁহার সন্ধানের জন্য ব্যস্ত।' প্রকৃতপক্ষে প্রীতিলতার বয়স তখন ২১ বছর। পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর উঠেপড়ে লাগে প্রীতিলতার সন্ধান পেতে। কিন্তু তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এদিকে নতুনভাবে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনা করেন মাস্টারদা। ঠিক করেন এই সংগ্রামে নারী বিপ্লবীদের অংশগ্রহণে অধিকার দেবেন। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের সময় ১৯৩০ সালে ওই ক্লাব আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কোনো কারণে তা সফল হয়নি। চট্টগ্রাম শহরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত পাহাড়তলি স্টেশনের কাছে ছিল সেই ক্লাব। যা ছিল ব্রিটিশ সাহেবদের মূল প্রমোদ কেন্দ্র। সন্ধ্যার পরে ব্রিটিশ রাজকর্মীরা তাদের পরিবারদের নিয়ে নাচ-গান খাওয়া-দাওয়া হইচই, আনন্দ, স্ফূর্তি করত। ক্লাবের কর্মচারী, বেয়ারা, দারোয়ান ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয়র সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ক্লাবের সামনে সাইনবোর্ডে ইংরেজিতে লেখা ছিল, "ডগ এন্ড ইন্ডিয়ান প্রহিবিটেড।" এর থেকে প্রমাণ হয় সেইসময় ব্রিটিশরা ভারতীয়দের কোন চোখে দেখত। মাস্টারদা দল তৈরি করে দেন। ১৯৩২ সালের ১০ই আগস্ট চেষ্টা করা হয় ক্লাব আক্রমণের। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ক্লাবের কাছে ক্লাবের একজন বেয়ারা যোগেশ মজুমদারের বাড়িতে বিপ্লবীরা এসে আশ্রয় নেন। ইতিমধ্যে কল্পনা দত্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। মাস্টারদা ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্বের দায়িত্ব তুলে দেন প্রীতিলতার উপর। ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২ প্রীতিলতা পুরুষের পোশাকে নিজেকে তৈরি করেন। তাঁর পরনে ছিল ধুতি-পাঞ্জাবি, মাথায় পাগড়ি, পায়ে পাম্পশু। সেই মিশনে প্রীতিলতার সঙ্গে ছিলেন প্রফুল্ল দাস, কালীকিংকর দে, বীরেশ্বর রায়, শান্তি চক্রবর্তী। ছিলেন মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে ও পান্না সেন। রাত প্রায় সাড়ে দশটা ইয়োরোপিয়ান ক্লাবের ভিতর তখন চলছে হই-হুল্লোড় মদ্যপান। নারী-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ জন সেদিন উপস্থিত ছিল ক্লাবের ভিতর। যোগেশ মজুমদার বিপ্লবীদের উদ্দেশে সংকেত পাঠাতে বিপ্লবী দল প্রীতিলতার নির্দেশে তিন দলে ভাগ হয়ে ক্লাবের ভিতর আক্রমণের জন্য পজিশন নেয়। রিভলবার ও বোমা নিয়ে পূর্বদিকের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায় প্রীতিলতা নিজে, সঙ্গে শান্তি চক্রবর্তী ও কালীকিংকর দে, ক্লাবের দক্ষিণ দিকের দরজায় সশস্ত্রভাবে দাঁড়ায় মহেন্দ্র চৌধুরী ও সুশীল দে, উত্তরের জানালার সামনে এগিয়ে যায় পান্না সেন, বীরেশ্বর রায় ও প্রফুল্ল দাস, হাতে রিভলবার রাইফেল হাত বোমা। প্রীতিলতা হুইসেল বাজিয়ে আক্রমণের নির্দেশ দিতেই গুলিবোমার আওয়াজে কেঁপে ওঠে ক্লাবঘর। নিভে যায় ক্লাবঘরের বাতি। অন্ধকারে অনেকে মাটিতে শুয়ে পড়ে, অনেকে ছোটাছুটি করতে থাকে। কয়েকজন ইংরেজ অফিসার তাদের রিভলবার দিয়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। অন্ধকারে একটা গুলি প্রীতিলতার শরীরের বাঁদিকে লাগে। —কম্পানি, ফল ইন! প্রীতিলতার নির্দেশ, কাজ শেষ, সবাই ফিরে চল। কুইক মার্চ।

অন্ধকারে সকলে গা ঢাকা দেয়। হঠাৎ তারা দেখে তাদের সঙ্গে প্রীতিলতা নেই। মহেন্দ্র চৌধুরী পাগলের মতো পিছনের দিকে এগিয়ে এসে দেখে প্রীতিলতা অন্ধকারে একপাশে দাঁড়িয়ে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে শরীর। মহেন্দ্র বলে, 'প্রীতিদি, এক্ষুনি চলুন, মিলিটারিরা ছুটে আসছে।'

প্রীতিলতা মৃদু হেসে বলেন, 'না ভাই, রিভলবারটা নাও। মাস্টারদাকে দিও। তাঁকে আমার প্রণাম জানিও।'

ছুটে আসে কালীকিংকর দে। প্রীতিলতা ততক্ষণে পটাশিয়াম সায়ানাইড মুখে তুলে নিয়েছেন। কালীকিংকর দে'র কাছে চেয়ে নেন আরো পটাশিয়াম সায়ানাইড। সবটাই মুখে নিয়ে ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে। প্রীতিলতাকে সেই অবস্থায় রেখে শেষ

শ্রদ্ধা জানিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে বিপ্লবীরা।

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২-এর আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়, 'গতকল্য রাত্রি ১১টার সময় বিপ্লবী বলিয়া বর্ণিত একদল লোক পাহাড়তলী ইনস্টিটিউট নামক আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ইয়োরোপিয়ান ক্লাবে অতিশয় দুঃসাহসিকভাবে ইয়োরোপিয়ানদের উপর আক্রমণ করে। আক্রমণকারীর দলে পুরুষের বেশে সজ্জিতা একজন নারীও ছিল।

আক্রমণকারীরা ঘরের মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল। ইহার ফলে একজন বৃদ্ধ ইয়োরোপিয়ান মহিলা নিহত এবং ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, সার্জেন্ট উইলস এবং অপর ছয়জন ইয়োরোপিয়ান আহত হন।

একজন স্ত্রীলোক ব্যতীত আক্রমণকারী দলের আর সকলেই পলাইয়া গিয়াছে। পুরুষের পোশাকে সজ্জিতা ২০ বৎসর বয়স্কা এই নারীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাহার মৃতদেহ ক্লাব ঘর হইতে কিছু দূরে পড়িয়াছিল। ... প্রকাশ যে এই স্ত্রীলোকটিকে কুমারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার বি.এ. বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। সে নাকি চট্টগ্রাম শহরের শ্রীযুক্ত জগৎবন্ধু ওয়াদ্দাদারের কন্যা ...।'

তদন্ত কাজ শেষ করে প্রীতিলতার দেহ তুলে দেওয়া হয় তাঁর পরিবারের হাতে। নীরবে সবার অগোচরে শেষকৃত্য সমাধা হয় অগ্নিকন্যার। পুলিশের অতিরিক্ত নজরদারির কারণে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সাহস করে অনেকে এগিয়ে আসতে পারেনি সেদিন। দেশমাতৃকার গর্ব বাংলার প্রথম মহিলা শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের দেহ ক্রমশ পঞ্চভূতে বিলীন হয়। সেই অগ্নিকন্যার মন যে কত নরম ছিল তা তাঁর বান্ধবী কল্পনা দত্ত এক আলাপচারিতার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। "কথা হচ্ছিল, পাঁঠা কাটতে পারব কিনা। আমি বলেছিলাম 'নিশ্চয় পারব, আমার মোটেই ভয় করে না।' প্রীতি উত্তর দিয়েছিল, 'ভয়ের প্রশ্ন না, কিন্তু আমি পারব না নিরীহ একটা জীবকে হত্যা করতে।' একজন তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল, 'কী, দেশের স্বাধীনতার জন্যও তুমি অহিংস উপায়ে সংগ্রাম করতে চাও?' আমার মনে পড়ে প্রীতির স্পষ্ট জবাব, 'স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতেও পারব, প্রাণ নিতে মোটেই মায়া হবে না। কিন্তু নিরীহ জীব হত্যা করতে সত্যি মায়া হয়, পারব না।"

কল্পনা দত্তের লেখনীতে পাওয়া যায় প্রীতির মৃত্যুর পরে তাঁর বাবা-মায়ের মানসিক অবস্থার কথা। "প্রীতির বাবা শোকে-দুঃখে পাগলের মতো হয়ে গেলেন, কিন্তু প্রীতির মা গর্ব করে বলতেন, 'আমার মেয়ে দেশের কাজে প্রাণ দিয়েছে।' তাঁদের দুঃখের পরিসীমা ছিল না, তবু তিনি সে দুঃখকে দুঃখ মনে করেননি। ধাত্রীর কাজ নিয়ে তিনি সংসার চালিয়ে নিয়েছেন, আজো তাঁদের সেভাবে চলছে। প্রীতির বাবা প্রীতির দুঃখ ভুলতে পারেননি। আমাকে দেখলেই প্রীতির কথা মনে পড়ে যায়, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।"

অন্তর্ধান হওয়ার পর অজ্ঞাতবাস থাকাকালীন প্রীতিলতা তাঁর মাকে যে পত্র লেখেন তা সত্যি মর্মস্পর্শী। মায়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ভালবাসা অফুরন্ত প্রাণের টান যার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিটি ছত্র লিখতে লিখতে প্রীতিলতা যেন চোখের জলে ভেসেছেন এতটাই হৃদয়স্পর্শী সে ভাষা। মায়ের কাছে লেখা অগ্নিকন্যার সে পত্রের কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া গেল।

'মাগো, তুমি আমায় ডাকছিলে? আমার মনে হল তুমি শিয়রে বসে কেবলই আমার নাম ধরে ডাকছো, আর তোমার অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছে। মা, সত্যিই কি তুমি এত কাঁদছো? আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না—তুমি আমায় ডেকে হয়রান হয়ে গেলে। ...

মা, তুমি আমায় ক্ষমা করো—তোমায় বড় ব্যথা দিয়ে গেলাম। তোমাকে এতটুকু ব্যথা দিতেও তো চিরদিন আমার বুকে বেজেছে। তোমাকে দুঃখ দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। আমি স্বদেশ-জননীর চোখের জল মোছাবার জন্য বুকের রক্ত দিতে এসেছি। তুমি আমায় আশীর্বাদ কর, নইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। ...

আমার অভাব যে তোমাকে পাগল করে তুলেছে, তা আমি জানি। মাগো, আমি শুনেছি তুমি ঘরের দরজায় বসে সবাইকে ডেকে ডেকে বলছো—"ওগো তোমরা আমার রানিশূন্য রাজ্য দেখে যাও।" ...

মাগো, তুমি অমন করে কেঁদো না! আমি যে সত্যের জন্য—স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না?

কি করবে মা? দেশ যে পরাধীন! দেশবাসী যে বিদেশির অত্যাচারে জর্জরিত! দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলভারে অবনতা, লাঞ্ছিতা, অবমানিতা! ...

আর কেঁদো না মা। যাবার আগে আর একবার তুমি আমায় স্বপ্নে দেখা দিও। আমি তোমার কাছে জানু পেতে ক্ষমা চাইব।

আমি যে তোমার মনে বড়ই ব্যথা দিয়ে এসেছি মা! ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি! তুমি আদর করে আমাকে বুকে টেনে নিতে চাইছ, আমি তোমার হাত ছিনিয়ে চলে এসেছি। খাবারের থালা নিয়ে আমায় কত সাধাসাধিই না করেছ—আমি পিছন ফিরে চলে গেছি।

না, আর পারছি না। ক্ষমা চাওয়া ভিন্ন আর আমার উপায় নেই। আমি তোমাকে দুদিন ধরে সমানে কাঁদিয়েছি। তোমার কাতর ক্রন্দন আমাকে এতটুকু টলাতে পারেনি।

কী আশ্চর্য মা! তোমার রানি এত নিষ্ঠুর হতে পারল কী করে? ক্ষমা করো মা, আমায় তুমি ক্ষমা করো!'

প্রীতিলতা বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর জীবনের গতিপথ কোন ধারায় বইতে শুরু করেছে। সে স্রোত শুধু এগিয়ে চলার পথ দেখায়। প্রীতিলতা এগিয়ে গিয়েছিলেন লক্ষ্য স্থির রেখে। দেশমাতৃকার চরণে ঢেলে দিয়েছিলেন নিজের শেষ রক্তবিন্দু।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বাংলার প্রথম নারী শহিদ অগ্নিকন্যা প্রীতি ওয়াদ্দেদারের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে ও থাকবে। তাঁর প্রতি রইল আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

আমাদের ধর্মই আমাদের তেজ, বীর্য, এমনকি জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি। ... এই ধর্মেই আমাদের জাতীয় মন, জাতীয় প্রাণপ্রবাহ দেখিতে পাইবে। ধর্ম অনুসরণ কর, তোমরা গৌরবান্বিত হইবে; ধর্ম পরিত্যাগ কর, তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয়।

—স্বামী বিবেকানন্দ

বসাক বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড

৪, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

Ph. : 22416497, Mobile : 8240224244, E-mail : basakbookstorepvtltd1997@rediffmail.com

শিশু শ্রেণি হইতে পঞ্চম শ্রেণির স্কুলের বই এবং ছোটো ও বড়োদের গল্পের বইয়ের প্রকাশক

❖ ব্যাকরণ বই ❖
স্মার্ট বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা শিক্ষা (৩,৪,৫)
৯৮, ৯৮, ১২০
❖ ছড়ার বই ❖
চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে ৭৫
❖ ABC Books ❖
Kids ABC (Anglo-Bengal) 75
❖ English Ryhmes Books ❖
Basak Nursery Rhymes (1,2) 75/-
❖ Grammar Books ❖
Basak English Grammar Translation, Composition with Word Book (3,4,5) 100/-, 100/-, 120/-
❖ অঙ্ক বই ❖
বসাকের গণিত শিক্ষা (১) ৭৫
❖ Conversation Books ❖
Daily Conversation (1) 65/-
❖ ভূগোল বই ❖
Current ভূগোল (৩,৪) ৯০
❖ বিজ্ঞান বই ❖
Current বিজ্ঞান (৩,৪) ৯০

❖ ইতিহাস বই ❖
Current ইতিহাস (৩,৪) ৯০
❖ বাংলা দ্রুতপঠনের বই ❖
ছোটোদের রামায়ণ ৭০
ছোটোদের মহাভারত ৮০
গরবিনি ভারত ৭৫
AESOP'S FABLES 80/-
❖ Drawing Books ❖
Sit & Draw (0,A,1-6) 70/-
❖ Computer Books ❖
কম্পিউটারের (১ম-৪র্থ) ৬০-৭৫
❖ ব্রহ্মচারিণী বেলাদেবী ও ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ❖
শ্রীম কথিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৫০০
❖ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ❖
বঙ্কিম রচনাবলী (উঃ ৪০০ সাঃ ৪০০)
❖ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ❖
শরৎ রচনাসমগ্র (১, ২, ৩) প্রতি খণ্ড ৩০০
ছোটোদের শরৎ রচনা সমগ্র ১৫০

❖ সুকুমার রায় ❖
বিজ্ঞানীদের জীবনী ৮০, সুকুমার রচনা সমগ্র ২৫০, আবোল তাবোল ৭০, খাইখাই ৬০, বহুরূপী ৪০, গল্পের ঝুলি ৬০, বিজ্ঞানের গল্প ২০০, জীবজন্তুর গল্প ১০০, পাগলা দাশু ৫০, হযবরল ৩০
❖ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ❖
ছোটোদের রবীন্দ্র রচনা সমগ্র ২০০
❖ বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় ❖
ছোটোদের বিভূতি রচনা সমগ্র ১২০
❖ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ❖
অমৃতময়ী সারদা ৩০০, ৫ ডজন বাঘ ১০০
গৌরাঙ্গ চরিত সুধা ২০০
আদ্যাপীঠে কেন যাই ৬০
অমৃতপুরুষ বিবেকানন্দ ২০০
বিবেকানন্দের কথামৃত ৩০০
একান্ন পীঠ ও দশমহাবিদ্যা ৬০
❖ দেবাশীষ দে/সুশান্তকুমার পাল ❖
জুলে ভের্ন রচনা সমগ্র ৫০০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচনা সমগ্র (১,২) ৩০০

প্রবন্ধ বিচিত্রা

বারাকপুরে গঙ্গার তীরে অবস্থিত

শিবশক্তি অন্নপূর্ণা

স্মৃতিময় মিত্র

দেবী অন্নপূর্ণার মহিমা সম্পর্কে 'অন্নদামঙ্গলে' ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

"যে জন করায় অন্নপূর্ণা উপাসনা
বিধি হরি হর তার করয়ে মাননা।।
ইহলোকে নানা ভোগ করে সেইজন।
পরলোকে মোক্ষ পায় শিবের লিখন।।"

দক্ষিণামূর্তি সংহিতা গ্রন্থে চতুর্ভুজা এবং পদ্ম, অভয়, অঙ্কুশ ও বরদহস্তা অন্নপূর্ণার বর্ণনা রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় মঙ্গলকাব্য রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রচিত 'অন্নদামঙ্গলে' দেবী অন্নপূর্ণা মাহাত্ম্য, পূজন ইত্যাদির সুবিস্তারিত বর্ণনা আছে। চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে মা অন্নপূর্ণার পূজা হয় সারা দেশ জুড়ে। এছাড়াও বিভিন্ন শাস্ত্র যেমন অন্নদাকল্প, অন্নপূর্ণা উপনিষদ, কারণাগম প্রভৃতি শাস্ত্রে দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য ইত্যাদি সুবিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

শাস্ত্রীয় মতানুসারে দেবী অন্নপূর্ণা সত্ত্বগুণে সম্পন্না, যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি ত্রিগুণাতীতা। নিরুত্তর তন্ত্রে যে অষ্টাদশ মহাবিদ্যার উল্লেখ আছে তন্মধ্যে বাগেশ্বরী এবং অন্নপূর্ণা অন্যতম। বহুলপ্রচলিত অন্নপূর্ণা মূর্তি রক্তবর্ণা, দ্বি ভুজা, মুক্তাহার বিভূষিতা, চন্দ্রকলা শোভিতা, ত্রিনয়না এবং ভগবান শিবকে ভিক্ষাদানে নিত্যরতা। শুধুমাত্র বঙ্গদেশেই নয়, মন্দিরের শহর নামে খ্যাত কাশীর শ্রীমন্দিরের দ্বিতলে মা অন্নপূর্ণার মূর্তি দশনামী সন্ন্যাসীবৃন্দ কর্তৃক পূজিতা হয় নিয়ম করে। বাহ্যদৃষ্টিতে দেবী কৃপায় ভক্তগৃহ যেমন পূর্ণ হয় অন্ন, বস্ত্র, পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি পার্থিব দ্রব্যে ঠিক তেমনি দেবীকৃপায় স্নাত-সাধক তৃপ্তিলাভ করেন তাঁর প্রকৃত পরমার্থ ক্ষুধা নিবারণের। দেবী শুধুমাত্র উদরের ক্ষুধা নিবারণের দেবী নন, তিনি আনন্দময়ী পরব্রহ্মময়ীও বটে যিনি সাধককে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের পরিবর্তে আনন্দের সহিত সাধনায় ব্রতী হওয়ার শিক্ষাদান করেন। তাই দেবীমূর্তিতে বিরাজমান ভিক্ষা গ্রহণকারী নৃত্যরত শিব যেন ইঙ্গিত করেন যোগীদের মা অন্নপূর্ণার সাধনে মগ্ন হতে। তবে মহাদেবকে প্রদেয় ভিক্ষার প্রকৃত অর্থ হল ব্রহ্মচৈতন্য দান যা লাভ করে যোগীশ্রেষ্ঠ শিব-শঙ্কর পরম তৃপ্ত এবং ব্রহ্মানন্দে নৃত্যরত। প্রকৃতপক্ষে দেবী অন্নপূর্ণা স্বয়ং ব্রহ্মময়ী তিনি একদিকে ব্রহ্ম ও অন্যদিকে শক্তিরূপিণী মা।

শঙ্করাচার্য সহ বিভিন্ন যোগী দেবী অন্নপূর্ণার কৃপায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। নিদাস নামক যোগী ব্রহ্মজ্ঞ ঋভুকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার পথ জিজ্ঞাসা করায় তিনি নিদাসকে দেবী অন্নপূর্ণার সপ্তবিংশতি বর্ণাত্মক মন্ত্রের সাধনার কথা ব্যক্ত করেন এবং জানা যায় যে দীর্ঘদিনের তপস্যার ফলে দেবী তুষ্ট এবং কৃপাপরবশ হয়ে তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন। অন্নদামঙ্গল কাব্যে কাব্যকার ভারতচন্দ্র দেবীপূজার মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলেছেন যে—"দেবীপূজার ফলে শুধুমাত্র অন্ন-বস্ত্র নয় চতুঃবর্গ প্রাপ্ত হয় এবং কালকূট বিষও অমৃতে পরিণত হয়।" শুধুমাত্র ভারতচন্দ্র নয় পরবর্তীকালে বহু শক্তিসাধক তাঁদের শাক্ত পদাবলীতে দেবী অন্নপূর্ণার বিভিন্ন মাহাত্ম্য ও কৃপার কথা উল্লেখ করেছেন। দেবীর কৃপায় পার্থিব জগৎ সুন্দর ও সুগম হয় সাধকদের মতে।

মা অন্নপূর্ণার পূজা শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরে সুদূর রোমেও মা অন্নপূর্ণা—"অন্ন পেরেন্না" নামে পূজিতা হন চৈত্র মাসে। মিশর ও গ্রিস দেশে আইসিস ও সিরিস নামে পূজিতা হন। ব্রহ্মরূপিণী দেবী যে ত্রিলোকের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের মূল সে কথা শাস্ত্রেই উল্লেখ আছে। দেবী অন্নপূর্ণা অন্ন-বস্ত্র-ব্রহ্মচৈতন্য জ্ঞান দান করে নিরন্তর জগতের জীবসমগ্রকে পালন করে চলেছেন। তাই দেশে-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় ইচ্ছাময়ী মা ভিন্ন ভিন্ন রূপে পূজা গ্রহণ করে ভক্তদের উপর কৃপাদান করেন।

ঐতিহাসিক শহর সিপাহী বিদ্রোহের উৎপত্তিস্থল সহ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও বড়লাটের স্মৃতিবিজড়িত বারাকপুর

লেখক—বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক।

● বারাকপুরে মা অন্নপূর্ণা।

শহরের টিটাগড় সংলগ্ন জায়গার বিভারসাইড রোডে পবিত্র গঙ্গার ধারে অবস্থিত মা অন্নপূর্ণা মন্দিরটি প্রায় ১৫০ বছর ধরে ভক্তদের শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের এক অন্যতম পীঠস্থান। প্রথম দর্শনে বিভ্রম জাগে এ যেন ঠিক দক্ষিণেশ্বরের মতো অবিকল। একইরকম সাদৃশ্যপূর্ণ দুটি মন্দিরে অধিষ্ঠান করছেন মা ভবতারিণী দক্ষিণেশ্বরে আর একটিতে বারাকপুরে মা অন্নপূর্ণা। বঙ্গীয় স্থাপত্যশৈলীর নবরত্ন ধারায় নির্মিত মন্দিরদুটি। শিল্পকীর্তিও এক। আবার আগরপাড়া অঞ্চলে আছে 'রাধাগোবিন্দ জিউ'র মন্দির যার নির্মাণশৈলীও দক্ষিণেশ্বর মন্দির আদলে। দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন স্বয়ং রানি রাসমণি, বারাকপুরের অন্নপূর্ণা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন রানি রাসমণির কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বা দেবী আর 'রাধাগোবিন্দ জিউ'র মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন রানি রাসমণির প্রদৌহিত্র বধূমাতা গিরিবালা দেবী।

জানবাজারের স্বনামধন্য ধনী জমিদারবাবু রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী রানি রাসমণি ছিলেন ধার্মিক, জনহিতৈষী মানবদরদী ও মহীয়সী মহিলা। জমিদার রাজচন্দ্রবাবুর দেহাবসানের পর জমিদারির ভার নিজের হাতে তুলে নেন। অত্যন্ত সুদক্ষতার সাথে জমিদারি পরিচালনার সাথে সাথে সামাজিক অনেক জনহিতকর কার্য যেমন নারীশিক্ষার জন্য স্কুল, রাস্তাঘাট নির্মাণ, হাট-বাজার বসানোর জন্য জমিদান, লাইব্রেরি নির্মাণ, মন্দির নির্মাণ ইত্যাদি তাঁকে এক অনন্য মহীয়সী নারীতে পরিণত করেছে। এই জনহিতকর কার্যকলাপের জন্য তিনি জনমানস থেকে ব্রিটিশ প্রশাসকদের কাছে লোকমাতা নামে পরিচিত।

কিংবদন্তি আছে যে রানি রাসমণি মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য কালীঘাট (ভবানীপুর) অঞ্চলে 'বাংলা স্কুল' স্থাপন করেছিলেন (৭১নং হরিশ চ্যাটার্জি, কল-২৫)। একথা স্থানীয় লোকেরা একবাক্যে স্বীকার করে (পুরশ্রী, সেপ্টেম্বর, সংখ্যা ২০০৪ দ্রষ্টব্য)। এছাড়াও রাসমণি মেট্রোপলিটন হিন্দু কলেজ নির্মাণের জন্য তৎকালীন ১০ হাজার টাকা দান করেছিলেন। এছাড়াও জানা যায় বিধবা বিবাহ আন্দোলনে রানি রাসমণির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বিদ্যাসাগরের সাথে।

রানি রাসমণির চার কন্যা ছিল—পদ্মমণি, কুমারী, করুণাময়ী ও জগদম্বা। রানিমার বিশ্বস্ত ও ভরসার জামাই ধার্মিক মথুরমোহন বিশ্বাসের সাথে সেজ মেয়ে করুণাময়ীর বিবাহ হয়। কিছুকাল পর করুণাময়ী পরলোকগতা হলে রানি মথুরবাবুর সাথে ছোট মেয়ে জগদম্বার বিবাহ দেন। জগদম্বা ও মথুরবাবুর ছয়টি সন্তান তিনটি পুত্র ও তিনটি কন্যা।

সেবার ১২৫৪ বঙ্গাব্দে (১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে) রানি রাসমণি বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শনের জন্য ২৫টি নৌকা বজরা সহযোগে জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাস, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও দাসদাসী সহ ছয় মাসের দ্রব্যাদি নিয়ে গঙ্গাবক্ষে কাশীযাত্রা করেন। রানির নৌবহর যখন বিশাল বিস্তৃত গঙ্গাবক্ষে বর্তমান দক্ষিণেশ্বরের উপকূলে তখন সন্ধ্যা নামে। হঠাৎই শীতের শান্ত পরিবেশ দুর্যোগের আকার ধারণ করে। ফলে জলপথে অগ্রসর অসম্ভব হওয়ায় রানিমার আদেশে দক্ষিণেশ্বরেই নৌকার নোঙর ফেলে রাত্রি কাটানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেই রাত্রেই বজরায় স্বপ্নে মা জগজ্জননী রানিকে আদেশ করেন—"কাশী যাবার আর প্রয়োজন নেই, ভাগীরথীর পূর্ব তীরে মনোরম স্থানে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর। আমি এই মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়ে তোমার নিত্যপূজা গ্রহণ করব।" রানি রাসমণির ইষ্ট দেবতা মা কালী। শুরু হয় মন্দির নির্মাণের কাজ ১৮৫৫ সালে, সম্ভবত ৩১শে মে জগদেশ্বরী কালীমাতা প্রতিষ্ঠিত হন। পরবর্তীকালে রানি রাসমণির ধার্মিক গুরু ও পথপ্রদর্শক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ভবতারিণী রূপে মায়ের পূজা করেন ও মা ভবতারিণীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এদিকে অন্নপূর্ণা দর্শনে বিঘ্ন ঘটায় ধার্মিক জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাস মনে মনে অন্নপূর্ণা মন্দির প্রতিষ্ঠা করে মায়ের পূজা ও সেবা করবেন ঠিক করেন। ১৮৬১ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি রানি রাসমণি ইহলোক ছেড়ে ঈশ্বরলোকে যাত্রা করেন। পরবর্তীকালে মথুরবাবুর ইচ্ছা ও ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে তাঁর স্ত্রী জগদম্বা দেবী গঙ্গার ধারে জায়গা দেখা শুরু করেন মন্দিরের জন্য। তখন অবশ্য মথুরবাবু আর জীবিত ছিলেন না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আজ্ঞা নিয়ে মথুরমোহন বিশ্বাস ও জগদম্বা দেবীর বড় পুত্র দ্বারিকানাথ বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে বর্তমান যে জমিসংলগ্ন বিস্তৃত জায়গাটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চিফ ইঞ্জিনিয়ার সি. বি. স্টুয়ার্টের কুঠি সমেত ক্রয় করেন। আদতে এটি ছিল একটি নীলকুঠি। কিন্তু কুঠিটির নাম লালকুঠি। এই কুঠি থেকেই মন্দির স্থাপনের কাজকর্ম দেখাশুনা করা হত, যে জায়গাটি বর্তমানে আমরা দেখি মন্দিরের আগের জায়গাটি যা ফায়ার ব্রিগেডের কাজকর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়।

১৮৭১-৭২ সাল নাগাদ জগদম্বা দেবী বর্তমানে যেটি রাসমণি ঘাট নামে খ্যাত, সেখানে অবতীর্ণ হন, মন্দির নির্মাণের কাজকর্ম দেখতে আসেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে তৎকালীন প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করে ১৮৭৫ সালের ১২ই এপ্রিল (বাংলার ১২৮১ সালের ৩০শে চৈত্র) চৈত্র সংক্রান্তির দিনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় অষ্টধাতু নির্মিত দেবী অন্নপূর্ণা ও

বাবা শিবের বিগ্রহ। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রায় ২০ বছর পর বারাকপুরের গঙ্গার পূর্ব পারে প্রতিষ্ঠিত হয় সদাজাগ্রত মা অন্নপূর্ণা মন্দির। দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও অন্নপূর্ণা মন্দিরে দেবীমূর্তি দক্ষিণমুখী। অন্নপূর্ণা মন্দিরে সুবিশাল নাটমন্দির। পশ্চিমদিকে রয়েছে আটচালা বিশিষ্ট ছয়টি শিবমন্দির। দক্ষিণেশ্বরে অবশ্য ১২টি শিবমন্দির রয়েছে। কিন্তু স্থাপত্যশৈলী একই ধরনের দুই মন্দিরে। অন্নপূর্ণা মন্দিরের ছয়টি শিব মন্দিরের নাম—কল্যাণেশ্বর, কান্দেশ্বর, কিন্নরেশ্বর, কেদারেশ্বর, কৈলাসেশ্বর এবং কপিলেশ্বর। এছাড়া রয়েছে গোপাল মন্দির, রাধাগোবিন্দ মন্দির, হনুমানজির মন্দির ও মনসামন্দির। প্রতিদিন নিয়ম করে প্রতিটি মন্দিরে পূজাপাঠ হয়। শ্রাবণ মাসে ভক্তদের ঢল নামে শিবমন্দিরগুলিতে জল ঢালার জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি এই দেবালয় প্রাঙ্গণকে মহিমামণ্ডিত করে তুলেছে। মন্দির প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে এই যুগাবতার এই মন্দিরে পদার্পণ করেছিলেন চারবার। প্রথমবার জগদম্বা দেবীর ইচ্ছানুসারে মন্দির স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য। দ্বিতীয়বার এসেছিলেন মন্দিরের ভিত স্থাপন উপলক্ষে। তৃতীয়বার ১২৮১ সালের ৩০শে চৈত্র (১৮৭৫ সালের ১২ই এপ্রিল) চৈত্র সংক্রান্তির দিন মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে মাতৃদর্শনে এসেছিলেন। ওইদিনে মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে বেলগাছটি ছিল সেই পাথর বাঁধানো বেলগাছতলায় তিনি আসন গ্রহণ করেছিলেন। আজ অবশ্য সেই বেলগাছটি নেই। তবে সেই জায়গায় নতুন করে আরেকটি বেলগাছ লাগানো হয়েছে। বেলতলা সন্নিহিত কোণের দিকে একটি ঘরে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পদার্পণে ধন্য ঘরটিতে আজও নিয়মিত পূজাপাঠ হয়। বর্তমানে সেটি ধ্যানঘর নামে পরিচিত।

মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনেই ঠাকুরের শুভাগমন সম্পর্কে ঠাকুরের শ্রীমুখে উক্তি—"আমি চাণকে (বারাকপুরের পুরোনো নাম) অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠার সময় দ্বারিকানাথকে বলেছিলাম বড় দীঘিতে মাছ আছে গভীর জলে। চার ফেল, সেই চারের গন্ধে ওই বড়মাছ আসবে। এক একবার ঘাই দেবে। প্রেম ভক্তিরূপ চার।" (কথামৃত, পঞ্চম ভাগ, দ্বাদশ খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

অন্নপূর্ণা মন্দিরে চতুর্থবার ঠাকুরের শুভাগমন সম্পর্কে জানা যায়—সেদিন ছিল উল্টোরথ। গিরিন্দ্রবাবু দক্ষিণেশ্বরে আসিলে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন 'দ্যাখ গো আজ মাহেশের রথযাত্রা দেখতে ইচ্ছে করছে। একখানা নৌকা ভাড়া করো।' ঠাকুরের কথামতো গিরিন্দ্রবাবু একখানা নৌকা ভাড়া করিলেন। ঠাকুর লাটুকে (লাটু মহারাজ) সঙ্গে লইয়া নৌকায় চাপিলেন। তাঁহারা প্রথমে দ্বাদশ গোপাল দেখিয়া মাহেশের জগন্নাথ দেখেন। বিকেলে তাঁহারা নৌকাযোগে চাণকের অন্নপূর্ণা মন্দিরে এসে মাকে দর্শন করেন। (শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের জীবনকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়—'সেবক জীবন অধ্যায়')

বারাকপুরের মা অন্নপূর্ণা মন্দিরের গর্ভগৃহে কারুকার্য করা বেদী। রুপোর সিংহাসনে পদ্মের উপর মা অন্নপূর্ণা বিগ্রহটি শিবশক্তি অন্নপূর্ণা ঠাকুরানি নামে খ্যাত। জগদম্বা দেবীর অর্পণনামা অনুযায়ী তাঁর পরিবারের পুরুষরা অর্থাৎ তিন পুত্র দ্বারিকানাথ বিশ্বাস, ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস ও ঠাকুরদাস বিশ্বাসের বংশধরেরা পরম্পরা অনুসারে মন্দিরের সেবাইত হিসেবে নিযুক্ত। তাঁরাই মন্দিরে যাবতীয় উন্নতি, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজকর্ম দেখাশুনা করেন বলে জানা যায় বর্তমান অন্যতম বংশধর সেবাইত বিশ্বজিৎ বিশ্বাসের কাছ থেকে। প্রতি বছর চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে অন্নকূট সহযোগে ধুমধাম করে অন্নপূর্ণা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও মঙ্গলচণ্ডী পুজো, বিপদতারিণী পূজা, অম্বুবাচী পূজা, জন্মাষ্টমী পূজা, চাঁচর, দুর্গাপূজা, অন্নকূট সহ কালীপূজা, নবান্ন, মহালক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজা, হনুমান জয়ন্তী, মনসা পূজা, কল্পতরু উৎসব, দশহরায় গঙ্গাপূজা ইত্যাদি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন তিথি অনুসারে উল্টোরথের দিন ঠাকুরের শ্রীচরণ পাদুকা নিয়ে এসে বিশেষ পূজা হয়। বিভিন্ন মঠ-মিশনের মহারাজ সহ বহু ভক্ত সমাগমে মন্দির প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে ভগবান ও ভক্তের এক মিলন ক্ষেত্র। বহু দূরদূরান্ত থেকে ভক্তগণ মা অন্নপূর্ণার কৃপালাভের জন্য পুজো দিতে আসে এই মন্দিরে। মন্দিরে পূজা শুরু হয় ভোর ৫-৩০ থেকে চলে দুপুর ১২-৩০ অবধি। আবার বিকাল ৪টা থেকে ৮টা অবধি পূজা হয়। ভক্তদের অনুরোধে সেবাইতরা রোজ মায়ের ভোগপ্রসাদের ব্যবস্থা করেছে, ভোগের কুপন দেওয়া হয় মন্দির অফিস থেকে ১০-৩০ থেকে ১২টা পর্যন্ত। ভোগ বিতরণ হয় ১-৩০ থেকে।

মহামানবদের পদধূলিধন্য অবতার শ্রীঠাকুরের পদধূলি ও সদাজাগ্রত মা অন্নপূর্ণা ও বাবা মহাদেবের কৃপাধন্য এই পবিত্র মন্দির সকলের শান্তি ও আস্থার এক পবিত্র স্থল। ভক্তের সকল মনোবাঞ্ছা মা পূর্ণ করেন। সকলের মঙ্গল কর মা—

"অন্নপূর্ণে নমস্তভ্যং নমস্তে পরমম্বিকে।
তচ্চারুচরণে ভক্তিং দেহি দীনদয়াময়ি।।
অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণ বল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্য সিদ্ধার্থ্যং ভিক্ষাং দেহি নমহস্তুতে।।"

অভিধানের ইতিহাস

দেবপ্রসাদ মজুমদার

অভিধান কথাটির অর্থ শব্দকোষ। ভাষা শিক্ষার জন্য অভিধান অপরিহার্য। তাই অভিধান বিষয়ে আলোচনার পূর্বে ভাষা ও লিপির জ্ঞান থাকা উচিত। যে অভিব্যক্তির দ্বারা মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে—তাকে ভাষা বলে। আর ওই ভাষা যে সকল চিহ্নের দ্বারা লেখা হয় তাকে লিপি বলে। যেমন মনুষ্য সমাজে বহু ভাষা আছে তেমনি আছে বিভিন্ন লিপি। অভিধান বিষয়ে আলোচনা বা জানার জন্য ভাষা ও লিপির উৎপত্তির জ্ঞান থাকা জরুরি। গবেষকদের মতে ভাষার প্রথম উৎপত্তি হয়েছিল পুরনো প্রস্তর যুগের শেষভাগে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় এক লক্ষ বছর থেকে পঞ্চাশ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে। আর লিপির উদ্ভব হয়েছিল খ্রিস্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে রেড ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের দ্বারা। যার প্রাচীন নিদর্শন আমরা পেয়ে থাকি মিশরের চিত্রাক্ষর বা হাইয়ার গ্লিফিক্স আদিতম লিপির নিদর্শন।

সম্ভবত মিশরীয় চিত্রাঙ্কন বা চিত্রলিপির যুগেই মানুষ একটি শব্দকোষের প্রয়োজন অনুভব করেছিল। তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর সৃষ্টি ও লিপির ক্রমবর্ধমান উন্নতি হতে থাকলে মানুষের কাছে শব্দকোষ ক্রমশ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। প্রাচীনকালে বিদ্যাশিক্ষার উপায় ছিল শুনে শুনে এবং তা মনে রাখতে হত। কিন্তু একজনের স্মৃতিশক্তি যতই প্রখর হোক না কেন, তার পক্ষে একটি ক্রমবর্ধমান শব্দভাণ্ডারকে স্মৃতিতে ধরে রাখা অসম্ভব।

এছাড়া একটি শব্দের নানান অর্থ, ব্যুৎপত্তি ও ব্যবহার বিধি, সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দের ব্যবহার, শব্দের উৎকর্ষ অপকর্ষ, ধ্বনি, ব্যাকরণ বিধি প্রভৃতি কখনোই স্মৃতিতে ধরে রাখা সম্ভব নয়, সেইজন্য মানুষ ও ভাষাবিদেরা নিজেদের প্রয়োজনেই অভিধান সংকলনের কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ভাষাশিক্ষার জন্যও অভিধানের প্রয়োজন অপরিহার্য।

মানবসভ্যতার সমকালেই অভিধান রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়, কারণ পৃথিবীর প্রাচীনতম শব্দকোষের সন্ধান পাওয়া যায় মানবসভ্যতার প্রাচীন পীঠস্থান ব্যাবিলনে। বার্ণমুখ লিপিতে একটি মৃন্ময় ফলকের উপর লেখা হয়েছে সেই শব্দ ও প্রতিশব্দের তালিকা। নিনেভের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া এই ফলকের বয়স প্রায় ২৮০০ বছর—যা গবেষকদের অনুমান।

ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ হল ঋকবেদ। আর ভারতের প্রাচীনতম শব্দকোষ হল 'নিঘণ্টু' বা বহুবচনে নিঘণ্টকঃ। প্রকৃত প্রস্তাবে এটি বাছাই করা কিছু নির্দিষ্ট বৈদিক শব্দের সংগ্রহ। এই 'নিঘণ্টু'র সংকলন কাল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক বলে পণ্ডিতদের অনুমান। এই শব্দকোষের ব্যাখ্যা সূত্রেই যাস্ক খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁর 'নিরুক্ত' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই 'নিঘণ্টু' পরে নির্ঘণ্ট বা নির্ঘণ্টক রূপ নেয়।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা বৈদিক এবং পরবর্তীকালে সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিখ্যাত কোষগ্রন্থ হল—নামলিঙ্গানুশাসন। যার রচয়িতা হলেন বিখ্যাত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ও বৈয়াকরণ অমরসিংহ। এটির রচনাকাল খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতাব্দী এবং এই গ্রন্থের প্রচলিত নাম অমরকোষ। এই গ্রন্থটিকেও খাঁটি অভিধান বলা যায় না। এটি একটি প্রতিশব্দ কোষ। কারণ লিঙ্গানুযায়ী প্রতিটি শব্দ বা নাম সাজানোর জন্য এই গ্রন্থের এরূপ নামকরণ হয়েছে। অমরসিংহকে নিয়েও নানান বিতর্ক আছে। ঐতিহাসিকদের ধারণা অমরসিংহ ছিলেন কালিদাসের সমসাময়িক এবং মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম।

লেখক—বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক।

‘অমরকোষ’ রচিত হয়েছিল শ্লোকাকারে পদ্যছন্দে। পরবর্তীকালে অমরকোষের কতকগুলি টীকা রচিত হয়। এই টীকাগুলির মধ্যে একাদশ শতাব্দীতে সংকলিত ক্ষীরস্বামীর ভাষ্য, বাংলার সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব যা সম্ভবত ১১৫৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে রায়মুকুটের টীকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সর্বানন্দের টীকাকোষ গ্রন্থটিকে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম শব্দ সংগ্রহ রূপে পণ্ডিত মহল অভিহিত করে থাকেন। কারণ এই কোষগ্রন্থে প্রায় তিন শতাধিক প্রাচীন বাংলা শব্দের উল্লেখ আছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—কিঞ্চোহি—কেঁচো, খড়কি—খিড়কি, খলি—খোল বা খইল, বাদিয়া—বেদে, বেঙ্গ—ব্যাঙ, পিম্পড়ী—পিঁপড়ে ইত্যাদি।

অমরকোষের পরবর্তীকালে রচিত উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত অভিধান হল শাশ্বতের ‘অনেকার্থ সমুচ্চয়’। এই অভিধানটি বহু অর্থবাচক শব্দকোষ। এরপর যে সকল অভিধান বা শব্দকোষের নাম করা যায় সেগুলি হল—দশম শতাব্দীতে রচিত হলায়ুধের অভিধান রত্নমালা, একাদশ শতাব্দীতে যাদব প্রকাশের সংকলিত বৈজয়ন্তী, দ্বাদশ শতাব্দীতে সম্পাদিত হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণি, চতুর্দশ শতাব্দীতে গ্রথিত মেদিনীকরের অনেকার্থ শব্দকোষ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য যে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত সংস্কৃত অভিধান শব্দকোষই লেখা হয়েছিল শ্লোকাকারে পদ্যছন্দে। এই সকল অভিধানগুলি ছিল প্রধানত শব্দকোষ—এগুলির কোনো কোনোটি হয় একার্থবাচক নয়তো বহু অর্থবাচক। আধুনিক রীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ অভিধান রচিত হয়েছিল বোধকরি রাজা রাধাকান্ত দেবের (১৮২২ খ্রি.—১৮৫৮ খ্রি.) পৃষ্ঠপোষকতায়। এই অভিধানটির নাম ‘শব্দকল্পদ্রুম’। এই গ্রন্থটিকে প্রথম সংস্কৃত বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়ার সম্মান দেওয়া যায়।

এই সময় ভারতভূমিতে ইংরাজ মিশনারিদের আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁরাও নানা কারণে ভাষাশিক্ষা করতে সচেষ্ট। এর ফলস্বরূপ ইংরাজ মিশনারি আপজোনের রচিত ইংরাজি বাঙ্গলা ভোকাবুলারি এবং ফরস্টারের দুই খণ্ডে সম্পাদিত বাংলা ইংরাজি শব্দকোষ বা ভোকাবুলারি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থটির রচনাকাল ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ।

ইউরোপে এবং ইংরাজি ভাষায় অভিধান বা Dictionary রচনার ক্ষেত্রে স্যার স্যামুয়েল জনসনের নাম জগদ্বিখ্যাত। এই জনসন সাহেবের আদর্শে প্রথম বাংলা অভিধান সংকলন করেন রামকমল সেন। তাঁর সম্পাদনায় ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে ‘ইংরাজি-বাঙলা অভিধান’ প্রকাশিত হয়। এছাড়া বাংলা তৎসম শব্দের প্রথম নির্ভরযোগ্য অভিধান হচ্ছে রামকমল বিদ্যালংকারের রচিত ‘প্রকৃতিবাদ অভিধান’, যেটি ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এরপর যে অভিধানটির নাম করতে হয় সেটি হল গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের ‘শব্দসার’।

পরবর্তীতে আধুনিক কালের বাংলা অভিধানকারেরা ক্রমে বুঝতে পেরেছিলেন যে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের অভিধান রচনা করলেই চলবে না। কারণ বাংলা ভাষার অভিধান রচনা করতে গেলে আর্যভাষা, সংস্কৃত ভাষা ও তৎসম শব্দ ব্যতিরেকে তদ্ভব, দেশি, কিছু বিদেশি শব্দের ব্যুৎপত্তি, প্রয়োগ, অর্থ ও রূপান্তর সম্বন্ধেও সচেতন হওয়া প্রয়োজন কারণ বাংলা ভাষার মধ্যে প্রায় ৪৪ শতাংশ শব্দ কোল, ভিল, মুণ্ডা ও দেশজ ভাষা থেকে নেওয়া। এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবনা-চিন্তা নিয়েই পরবর্তীকালে সংকলিত হয়েছে যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির ‘বাঙ্গলা শব্দকোষ’ যা বাংলা ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। এরপর অক্সফোর্ড অভিধানের আদর্শে ও অনুকরণে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দুই খণ্ডে ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ নামে একটি অভিধান প্রকাশ করেন। এই অভিধানখানি তাঁর অক্লান্ত নিষ্ঠা, শ্রম ও প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করছে।

এছাড়া আধুনিক কালে সুশীল দে, সুপ্রকাশ রায়, কামিনীকুমার রায়, ভক্তিভূষণ মল্লিক প্রমুখ বিজ্ঞজনেরা কেউ কেউ প্রবচন কোষ, লৌকিক শব্দকোষ প্রভৃতি রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে আকাশবাণীর উদ্যোগে প্রায় ২০০০০ শব্দ সম্বলিত হিন্দি ইংরাজি অভিধানটি প্রকাশিত হয়েছে সেখানে বেতার সংবাদে ও সংবাদপত্রে ভাষার সংকলনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই হিসাবে অতি আধুনিক কালে রাজশেখর বসুর ‘চলন্তিকা’ অভিধানটিকে সর্বজনের ব্যবহারের উপযোগী বলা যায়। এই অংশে শুধুমাত্র সংস্কৃত ও বাংলা অভিধানের ইতিহাস সংক্ষেপে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে সংস্কৃত থেকে পালি, প্রাকৃত ও বাংলা অভিধানের বিষয় সম্যক আলোচনা করা হল না।

প্রবন্ধের পূর্বাব্দে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অভিধানের ইতিহাস আলোচিত হলেও এই আলোচনায় ইউরোপীয় অভিধান সম্বন্ধে দু-চার কথা আলোচনা না করলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রাচীন ইউরোপ ও ক্লাসিকাল যুগের প্রসিদ্ধ অভিধান বা শব্দকোষ রচয়িতাদের মধ্যে গ্রিক পণ্ডিত অ্যারিসটারডাস (২১৭ খ্রি.পূ.—১৫৩ খ্রি.পূ.) বাইজানটিয়ামের অ্যারিটোফেনাস

(২৫৭ খ্রি.পূ.—১৮০ খ্রি.পূ.) আলেকজান্দ্রিয়ার ভাষাতত্ত্ববিদ দাইদিয়াস (খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দী) এবং মারটিনেয়াস কাপেল্লার (খ্রিস্টিয় ৫ম শতাব্দী) নাম উল্লেখযোগ্য।

ল্যাটিন ভাষার প্রথম সার্থক অভিধান প্রণয়ন করেন ফরাসি পণ্ডিত আলোকজান্ডার দ্য ভিলা দেই (১১৬০-১২০৩ খ্রি.) ইটালিয়ান ভাষায় প্রথম সার্থক অভিধান রচনা করেন নিকালো তোম্মাসিও (১৮০২-১৮৭৪ খ্রি.)। তাঁর সম্পাদনায় প্রথম প্রতিশব্দকোষ রচিত হয় ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে। ফরাসি ভাষায় প্রথম অভিধান রচনা করেন এমিলি লেস্টার (১৮৬৩-১৮৭৩ খ্রি.)।

জার্মানির জেকব ও উইলি হেমগ্রিন অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর জার্মান ভাষার অভিধান সম্পাদনা করেন। এছাড়া ওলন্দাজ পণ্ডিত দানিয়েল-হাইনসিয়াস (১৫৮০-১৬৫৫ খ্রি.) ইউরোপের অভিধান রচনার অন্যতম পথিকৃতের গৌরব দাবি করতে পারেন।

ইংরাজি ভাষায় প্রথম শব্দকোষ সংকলন করেন রবার্ট কাউন্ট্রে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য ইংরাজি অভিধান হল নাথান বেইলির Universal Etomological English Dictionary। বেইলির এই অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণের উপর ভিত্তি করেই স্যামুয়েল জনসন তাঁর আট বছরের একক চেষ্টায় তাঁর বিখ্যাত অভিধান—A Dictionary of English Language গ্রন্থটি ১৭৫৫ খ্রি. রচনা করেন। পরবর্তীকালে দেশে ও বিদেশে বহু অভিধান রচয়িতাগণ এই জনসন প্রদত্ত Dictionary-কেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন।

ইংরাজি অভিধানেই প্রথম ধ্বনিতত্ত্ব সম্মত উচ্চারণ নির্দেশ দেখা যায়। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে জন ওয়েকারের অভিধানে এবং পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডের Philogical Society-এর উদ্যোগে ফুরনাভেলের সম্পাদনায় ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রথম প্রণালীবদ্ধ অভিধান সংকলনের চেষ্টা করা হয়। এই গ্রন্থটির নাম রাখা হয়—'A New English Dictionary on Historical Principles' এবং এর প্রকাশকাল ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ। পরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত এই অভিধানেরই নাম রাখা হয়—'The Oxford Dictionary' যা ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই সময় উপভাষা কোষ প্রণয়নের চেষ্টা করেন Joseph Wright. তাঁর অভিধানের নাম—The English Dialect Dictionary. পরবর্তীকালে Fowler-এর The Dictionary of Modern English usage ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

অপরাধ জগতের ভাষার উপর শব্দকোষ এবং অপভাষার শব্দকোষ রচনা করেন এরিক প্যাটারিজ। তাঁর গ্রন্থখানির নাম—Dictionary of the underworld এবং Dictionary of Slang and unconventional English। আধুনিক কালে ইংরাজি ভাষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছের অভিধানও রচিত হয়েছে। চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত শব্দসম্ভারের জন্য Dictionary of Medical Term-ও রচিত হয়েছে।

বর্তমানে বাংলা ভাষাতেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছের অভিধান প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া বাংলা ভাষাতে বিজ্ঞানভারতী বিবিধার্থ অভিধান, পৌরাণিক অভিধান, ইতিহাস অভিধান, জীবনী অভিধান, আইনবিষয়ক অভিধান প্রভৃতি রচিত হয়ে মানুষের একদিকে যেমন জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি লোকে অভিধান সচেতন হয়ে উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য যে বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধান প্রবর্তনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন পর্তুগিজ মিশনারিরা। এই বিষয়ে অবশ্যই পর্তুগিজ রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজক মানোএল দা আস্সুম্পসাঁও-এর নাম করতে হয়। তাঁর গ্রন্থখানি রোমান হরফে লিসবন শহর থেকে ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে ও পরবর্তীকালে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়।

জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় একাগ্রতা। রসায়ণতত্ত্বান্বেষী নিজের পরীক্ষাগারে গিয়া, নিজের মনের সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া তিনি যে-সকল বস্তু বিশ্লেষণ করিতেছেন, তাহাদের উপর প্রয়োগ করেন এবং এইরূপে তাহাদের রহস্য অবগত হন।

—স্বামী বিবেকানন্দ

হৃদয়বান পেলিকান

তাপস অধিকারী

● পেলিক্যান।

অল্প কিছু পাখি আছে যারা সারা বছর স্বামী-স্ত্রীরূপে গৃহস্থালি করে। বানায় সুশ্রী গৃহকোণ। কিন্তু বেশিরভাগ পাখিই ঘর বাঁধে সাময়িক। এ যেন সেই 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।' পশুপাখি সবার ক্ষেত্রেই কথাটি প্রযোজ্য। পাখিদের মধ্যে সন্তানলাভের কামনা প্রবল, তাই তো তারা এত উদ্যমী! তাই তো এত মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ, আত্মহারা আকাশনীলে! অজস্র প্রজাতির পাখি দুনিয়াময়। সন্তানলাভের কামনা পাখিদের মধ্যে দেখা যায় বছরে একবার। নির্দিষ্ট সময়ে কারুর কারুর ক্ষেত্রে একাধিকবার। এ সময়ে বহু প্রজাতির পাখির শরীরে দেখা মেলে বর্ণচ্ছটা পালকের বিস্তার, আচরণ এবং রকমসকমে অভিনবত্ব। অত্যন্ত আনন্দবিহ্বলতা, আবেগ, খুনসুটি ইত্যাদি অধিক মাত্রায় দেখা মেলে। এর মধ্যে কোনো কোনো পাখি তেমন আবেগতাড়িত হয় না, কিন্তু অপত্য স্নেহ ও হৃদয়ের অধিকারী হয়। অত্যন্ত সামাজিক, সন্তান-সন্ততি নিয়ে সুখী গৃহকোণে সংসার পাতে। মায়া-মমতা, মাতৃস্নেহ বিস্ময়কর। আলোচ্য পাখিটির নাম—গগনবেড় বা পেলিক্যান। এদের মাতৃস্নেহ ত্রিলোকপ্লাবিত মধুময় অমৃত।

গগনবেড় বা পেলিক্যান অদ্ভুত দর্শনের পাখি। বিজ্ঞানীদের ধারণা বারো কোটি বছর আগেও এই পাখি ছিল। মধ্যযুগে এরকম বিশ্বাস ছিল যে এই গগনবেড় বা পেলিক্যান নিজের বুক চিরে রক্ত বের করে তাদের বাচ্চাদের খাওয়াত আর তাদের শিশুপালনের এই কষ্টস্বীকারকে যিশুখ্রিস্টের কষ্টের সঙ্গে তুলনা করা হত। এর ফলে এরা সেবা, হৃদয়বান ও পরোপকারের চিহ্ন হিসেবে প্রচলিত ছিল। অত্যন্ত স্নেহে আর সযত্নে বাচ্চাদের এক জায়গায় এনে খাওয়ায়। বাচ্চাদের খাওয়ানোর দৃশ্য এক

লেখক—বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও পশু-পক্ষী বিশারদ।

কথায় অসাধারণ মমতাময় এক ছবি। মাছ খেয়ে খানিকটা হজম করে সেটাকে উগরে দিয়ে বাচ্চাদের খাওয়ায়। এদের মাতৃস্নেহ গল্পকাহিনিতে বিখ্যাত। ইংল্যান্ডের অভিজাত বংশের আর ধর্মীয় প্রতীকগুলিতে দেখা মেলে—একটা গগনবেড় ডানা মেলে তার বাসার ওপর দাঁড়িয়ে নিজের রক্ত দিয়ে সন্তানকে পুষ্ট করছে। নিচে লেখা থাকে—'ধর্মপালনরত পেলিক্যান'। ধর্ম শব্দটির অর্থ—'সন্তান-স্নেহ'। এ বিষয়ে একটি কিংবদন্তি : এক সময় নাকি কয়েকটা গগনবেড় বা পেলিক্যান তাদের সন্তানদের এমন কড়া শাস্তি দিয়েছিল, যে তারা মারাই যায়। সন্তান হারানোর শোকে আর অনুতাপে বিহ্বল হয়ে বাবা-মায়েরা নিজেদের বুকের রক্ত নিয়ে মৃত বাচ্চাদের ওপর ছিটিয়ে দিয়ে তাদের জীবন ফিরিয়ে এনেছিল।

পেলিক্যানিফর্মিস বর্গের পাখিদের প্রতিনিধি প্রধানত পেলিক্যানিডি গোষ্ঠীর পাখি পেলিক্যান। বাংলায় বলা হয়—গগনভেরী বা গগনবেড়। বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে—পেলেকানুস ফিলিপেনসিস। ইংরেজি নাম—Pelecan, উর্দুতে বলে—Hawasil আর হিন্দিতে বলা হয়—হাওয়াসিল বা কুবের। বড় ঝিল বা সমুদ্রের কাছাকাছি এই পাখির দেখা মেলে। অত্যন্ত মোটাসোটা আর বৃহদায়তনের এই পাখিটি মাছ-খেকো। জলের অবস্থান বুঝে স্থান পরিবর্তন করে। পৃথিবীতে এই পাখির আবির্ভাব ঘটে বহু বছর আগে। ভারতে পাওয়া জীবাশ্ম (তিন থেকে চার কোটি বছরের পুরনো) থেকে যা পাওয়া গেছে তা এখনকার জীবিতদের মতোই। নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা বলেন—বারো কোটি বছর আগেও এ পাখি ছিল। বর্তমানে ভারত, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, সিংহল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কানাডায় এদের দেখা মেলে। এক কথায় বলতে গেলে পৃথিবীর প্রায় সব উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই গগনবেড়দের বসবাস। লম্বায় কম করে পাঁচ ফুট হয়ে থাকে। সেই অনুপাতে উচ্চতা কম। লেজ ছোট। গলা লম্বা। সারা শরীর পালকে ঢাকা। পাগুলি এদের ছোট কিন্তু মজবুত। আকারে বিরাট আর ভারী গড়নের হলেও এদের শরীরের হাড় খুব হালকা। সেই কারণেই এরা অত্যন্ত ভালো উড়তে পারে। শুধু তাই নয়, গগনবেড়রা পরিযায়ীও হয়। এ বিষয়ে পরে আসছি। তার আগে কয়েকটি প্রজাতির গগনবেড় সম্বন্ধে জানাই।

বাদামি পেলিক্যান (Brown Pelican)

শরীরের সমস্ত পালক বাদামি। নিচের ঠোঁটের সঙ্গে লাগানো থলি থাকে। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার সমস্ত রকম প্রজাতিরই এই থলি থাকে। জল ছেঁচে মাছ ধরার থলি। এরাও মাংসাশী পাখি। থলির চামড়া রবার ক্লথের মতো স্থিতিস্থাপক। বাদামি পেলিক্যানদের একটি আলাদা রকম বৈশিষ্ট্য আছে, তা হল মাছ ধরার সময় শূন্যে উড়তে উড়তে হঠাৎ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদের মূল বাসস্থান পশ্চিম কানাডা ও দক্ষিণ আমেরিকা।

গ্রে পেলিক্যান (Grey Pelican)

এদের স্পটেড বিলডও বলা হয়। ছিটদার ঠোঁটওয়ালা গগনবেড় বলা হয় বাংলায়। ধূসর বা গ্রে গগনবেড়রা প্রধানত অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরীর বাসিন্দা, এছাড়া দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য জায়গাতেও এদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা খুবই সামাজিক এবং নিয়মানুবর্তী। বিশ্রামের সময় সকলে একসঙ্গে বিশ্রাম নেয়। ধূসর পেলিক্যান ভারতীয়। এদের দেখা মেলে ভালো সংখ্যায়। এদের অন্য দুটি প্রজাতি শীতকালে আমাদের দেশে আসে। এরা পরিযায়ী। ঠোঁটের উপরিভাগ নীল আর কালো ফোঁটা ফোঁটা দাগ দেখা যায়। ঠোঁটের নিচের চামড়ার থলিটি ফিকে বেগুনি। ওড়ার সময় ডানার প্রান্তভাগের কালচে পালক দেখা যায়। পূর্ণবয়স্ক পাখির গায়ের রঙ সাদাটে ধূসর। তরুণ বয়সে রঙ থাকে বাদামি। ছোট বড় বা মাঝারি দল বেঁধে এরা ঝিল বা জলাশয়ে সাঁতার কাটে। কখনো মাছের সন্ধানে থাকে সজাগ, কখনো জলে বিহার করে বিশ্রাম নেয়, কখনো বা ডাঙায় উঠে পালক পরিষ্কার করে নিজের ঠোঁট দিয়ে। ক্ষণকাল প্রসাধন সেরে আবার শুরু করে জলবিহার, চলে মাছের সন্ধান। ওড়বার সময় একই সঙ্গে ওড়ে এবং একই দিকে মাথা ঘুরিয়ে ওড়ে। এরা বাসা তৈরি করে ডাঙা জমির ওপরে। তাল-জাতীয় ঝাঁকড়া গাছের মাথাতেও বাসা বাঁধে। বাসা তৈরি করতে এদের তেমন স্থান পছন্দের ব্যাপার থাকে না। এই বাসায় এরা একটা থেকে চারটে ডিম দেয়। সাদা খড়িমাটি রঙের। ডিম ফুটে শিশু গগনবেড় বেরুতে সময় নেয় পঁয়ত্রিশ থেকে আটত্রিশ দিন। সদ্য ফুটে বের হওয়া শিশুটিকে খাওয়াতে বেশ কষ্ট করতে হয় বাবা-মাকে। অবশ্য খুব দ্রুত বড় হয়ে গিয়ে এক সপ্তাহ পরেই এরা বাবা-মা'র ঠোঁট থেকে অর্ধভুক্ত খাবার তুলে খেয়ে নিতে শেখে। কোনো গগনবেড়ই শিশুদের জ্যান্ত মাছ খাওয়ায় না। মা ও বাবা পাখিটি কিছুটা হজম হওয়া মাছ বার করে শিশুদের খাওয়ায়। ওড়ার উপযুক্ত হতে এদের অন্তত দু'মাস সময় লাগে।

এছাড়া দেখা মেলে গোলাপি আর সাদা গগনবেড়ের

পরিবারের সবচাইতে বড় ঠোঁটের অধিকারী হল অস্ট্রেলিয়ান পেলিক্যান। এর বিজ্ঞানসম্মত নাম---পেলিকানাস কনিস্পিসিল্লাটাস। এদের ঠোঁট দেড় ফুটেরও বেশি লম্বা হয়। এত বড় ঠোঁটের মালিক পাখিটির দেহ কিন্তু তুলনামূলক ভাবে ছোট। এদেরও খাদ্য মাছ। এরা ঠোঁট ফাঁক করে নিচের ঠোঁটের সাহায্যে চোখের পলকে মাছ তুলে নেয়। পাঁচ/সাতশো গ্রামের মাছ অনায়াসে জল থেকে তুলে নিতে পারে। সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জলও ওঠে। এদের ঠোঁট সংলগ্ন চামড়ার থলিতে প্রায় তিন গ্যালন জল ধরতে পারে। শীত কমতেই ইউরোপের বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় বিদেশি পাখিদের ভিড় জমে ওঠে। বিশেষ করে মিউনিখে। বিরল প্রজাতির পেলিক্যান ভিড় জমায়। সব পেলিক্যানই সামুদ্রিক পাখি। শীতকালে বাসা বাঁধবার জন্য ডাঙায় ভিড় করে। বিশাল ঠোঁটে মাছ শিকার করে। বিরাটাকার এই পাখিদের ডানার মাপই হয় এগারো ফুটের বেশি। অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং আরও কিছু দেশে এদের দেখা মেলে। সমুদ্রে বেড়ে চলা দূষণ এদের নিশ্চিহ্নের পথে নিয়ে চলেছে। গৃহস্থ ও সুন্দর এই পাখি জলের অবস্থা বুঝে স্থান পরিবর্তন করে। এরা প্রচুর পরিমাণে মাছ খায়।

ভারতে জলচর পাখিদের প্রজনন ক্রিয়ার জন্য দুটো সুবিধে থাকা আবশ্যক। জল থাকা চাই পর্যাপ্ত আর তাতে থাকা চাই অফুরন্ত মাছ। জলার মধ্যে এবং সংলগ্ন স্থানে গাছ থাকা চাই। নিরাপদ স্থান আবশ্যক। যাতে কোনো শিকারী প্রাণীর আর মানুষ না আসতে পারে। এরা যে ভীষণ উদ্বিগ্ন থাকে তাদের ডিম আর নবজাতকদের নিয়ে। পানকৌড়ির মতো এরাও দল বেঁধে শিকার করে কিন্তু শিকারকে তাড়া করে জলের নিচে ডুব দেয় না। জেলেরা যেমন অনেকখানি জায়গা জাল দিয়ে ঘিরে তারপর জালের প্রান্ত ধরে টানতে টানতে তীরে নিয়ে আসে অসংখ্য মাছ, এরাও তেমনি সদলবলে 'ব্যূহ' রচনা করে জলাশয়ে। বিশাল বিশাল ডানার ঝাপটায় মাছ তাড়িয়ে নিয়ে আসে তীরের দিকে। তারপর আরও কাছাকাছি এসে টপাটপ মাছগুলিকে তুলে নেয় লম্বা ঠোঁটের সাহায্যে আর ভরে নেয় ঠোঁট সংলগ্ন থলিতে। যৌথ পরিবার, সমবায়প্রথা, আবেগ-ভালোবাসা, স্নেহপরায়ণ সর্বোপরি আন্তরিকতায় পাখি জগতে এরা দৃষ্টান্ত বলা যেতেই পারে। প্রসঙ্গত, গগনবেড়ের থলির কথা একটু বলা যাক—এদের অসাধারণত্ব হচ্ছে এদের নিচের ঠোঁটের প্রকাণ্ড থলি। এ ব্যাপারে একটি প্রবাদ আছে—'পেলিক্যানের পেটে যত ধরে, তার চাইতে তার ঠোঁটে বেশি ধরে।' এদের নিচের চোয়ালের দুদিকে নমনীয় দুটি ধনুকের মতো হাড় থেকে এই থলি ঝুলে থাকে। এ যেন গগনবেড়ের বাজারের থলি। জল থেকে মাছ ছেঁকে তোলবার সময় এই থলিটি একটি জালের কাজ করে। বিশেষ করে যখন এরা দলবদ্ধ হয়ে মাছেদের তাড়িয়ে নিয়ে যায় তীরের দিকে, তখন থলিটা বিশেষ কাজে লাগে। ওপরকার ঠোঁটের আগায় একটি বাঁকানো কাঁটা মতোন থাকে। বড় মাছকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে কাঁটাটি বিশেষ কাজে দেয়। উত্তেজিত হলে থলিটা আবার ফুলে ওঠে।

অসাধারণ আমাদের জীব-বৈচিত্র্য। ক্ষণে ক্ষণে মুগ্ধতায় ভরে দেয় আমাদের মানব জীবন। সৃষ্টিকর্তার এই সৃষ্টি আমরা অপলকে চেয়ে দেখি।

পেলিক্যান বা গগনবেড় বলে নয়, বেশির ভাগ পশু-পাখির সম্বন্ধেই আমরা তেমন জানি না। না জানা দিক বহু আছে। এদের রকমসকম, সমাজজীবন গবেষণা করতে গিয়ে যেমন বিস্মিত হতে হয়, তেমনি চমকে উঠতে হয়। আবার মনোজগৎ অনাবিল আনন্দ-মুগ্ধতায় ভরে ওঠে। মনে হয় ধন্য আমাদের মানবজীবন।

অন্ধ্রপ্রদেশে গগনবেড় বেশ ভালো সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়। অসমে কাজিরাঙ্গায় আর মানস নদীতে গগনবেড় বা পেলিক্যান আরও অধিক সংখ্যক দেখা যায়। এখানে এদের গগনভেরী, ফুটকি ঠুঁটি বলা হয়। ১৯৪৬ সালে অন্ধ্র রাজ্যে কে. কে. নীলকান্তম মহাশয় আবিষ্কার করেন গগনবেড়দের সবচেয়ে বড় কলোনি। এর বহু পূর্বে ১৮৭৭ সালে ওটস্ ব্রহ্মদেশে সিট্টাং নদীতে বিখ্যাত পেলিক্যান কলোনি (বস্তি) আবিষ্কার করেন। সেটাকে তিনি 'নিঃশব্দ' বলে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটি এরকম—'এই বনে লক্ষ লক্ষ পাখি প্রজনন করে থাকে। তা সত্ত্বেও অদ্ভুত একটা নৈঃশব্দ এখানে বিরাজ করছে। পেলিক্যান জাতটা বোবা বলে মনে হয়।' তা কিন্তু মোটেই নয়। এদের গলার আওয়াজ বেশ ভালো। অদ্ভুত একরকম তালি বাজানোর মতো শব্দ মাঝেমধ্যে করে থাকে। এছাড়া চড়াই-উতরাই ডাক শোনা যায়। তবে এটাও ঠিক, অন্য অনেক পাখির মতো সমানে ডাকা এরা পছন্দ করে না।

মা গগনবেড় মাছ খেয়ে খানিকটা হজম করে সেটাকে উগড়ে দিয়ে তার সন্তানদের খাওয়ায়। অত্যন্ত সযত্নে আর অপত্য স্নেহে ছোট্ট ছোট্ট শিশুদের খাওয়ায় মা পাখি। সজাগ থাকে যাতে কোনো শত্রুপক্ষের নজরে না পড়ে তার আদরের

ধনেরা! একটু ভুলচুক হলেই বাচ্চাকে আঁকড়ে ধরে। যেন বলতে চায়—'বাছা তোর লাগেনি তো!' যেটা খুব মজার ব্যাপার, সেটা হল—ছোট্ট শিশুটির মাথা, তারপর গলা, এমনকি গোটা শরীরটাই মা পাখির শরীরের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। কখনো কখনো দু'তিনটে খুব ছোট শিশু সবাই একসঙ্গে মায়ের শরীরে থলির মধ্যে ঢুকে পেটুকের মতো মাছ খেতে থাকে। এ দৃশ্য এককথায় অনবদ্য। বাজিকরের তরোয়াল গেলবার খেলা এর কাছে তুচ্ছ।

আকারে মস্ত বড় হলেও একবার হাওয়ায় ভেসে পড়তে পারলে বেশ সুন্দর উড়তে পারে। পা দুটি গুটিয়ে মাথাটাকে পিছিয়ে ঘাড়ের ওপরে রেখে, বেজায় বড় ঠোঁটটাকে গলার ওপর পেতে অনেকটা ইংরেজি 'এস' অক্ষরের মতো করে এরা অনায়াসে হাওয়ায় ভেসে যায়। এত ভারী শরীর নিয়েও ভয়ানক উঁচুতে উঠতে পারে এরা। শুধু তাই নয়, শূন্যে পাক খায়, ডিগবাজি খায়, নানারকম কসরত করে, যা সত্যি সত্যিই বিস্ময়কর। এদের একটানা ওড়ার সময় ডানার আওয়াজ শোনায় অনেকটা শিস দেওয়ার মতন। এত বড় শরীর নিয়ে অত উঁচুতে মহাশূন্যে ওঠে কী করে? কেমনভাবে ওড়ার সময় এমন কসরত দেখায়? মনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্নযুগল ঘুরপাক খায়। আসলে এদের শরীরের বেশ কয়েকটি হাড় সছিদ্র ও কম বেশি বায়ুপূর্ণ। কয়েকটি হাড় আবার বাঁশের মতো ফাঁপা। এদের ফুসফুস সংলগ্ন কয়েকটি বায়ুথলি বেশ বড়। এইসব কারণে এদের শরীরের আয়তন অনুযায়ী এদের ওজন অনেক কম হয়। তাই এত উঁচুতে এরা উঠতে পারে। এমনিতে জলচর পাখিরা অধিক উচ্চতায় ওড়াই পছন্দ করে। গগনবেড় যখন ওড়ে, দলবল নিয়ে ওড়ে। একজনের ডানা নাড়তে যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য অন্যজন প্রয়োজন মতো দূরত্ব রাখে। অধিকাংশ সময় গগনবেড় জলেই কাটায়। প্রয়োজনে জল ছেড়ে অনায়াসে আকাশে উঠে পড়ে।

গগনবেড় যেখানে বাসা বাঁধে সেখানে বেশ বড় এলাকা জুড়ে রীতিমতো নিজেদের একটা উপনিবেশ গড়ে তোলে। বড় বড় ঝাঁকড়া পাতাওয়ালা গাছ, যেমন—তাল, নারকেল, বাবলা প্রভৃতি গাছের মাথায় বাসা বাঁধতে পছন্দ করে। একই গাছে পাশাপাশি একাধিক বাসার দেখা মেলে। বাসাগুলো একেবারেই শ্রীহীন। কোনোরকমে কাঠিকুটি দিয়ে দাঁড় করায়। সব গগনবেড়ই দক্ষ সাঁতারু, খুব ভালো উড়তে পারে। দৌড়তে মোটেই পারে না। এরা বেঁচে থাকতে পারে ত্রিশ বছরের কিছু বেশি। ভারতীয় গগনবেড় বা পেলিক্যানের চোখের রঙ অনেকটা হলদেটে সাদা। চোখটাকে ঘিরে চামড়ার ওপরে একটি সোনালি রঙ দেখা যায়। অন্য জলচর পাখির মতো এদের পা-দুটির চারটি আঙুল পাতলা চামড়া দিয়ে পরস্পর জোড়া। এতে জলে সাঁতার কাটার খুব সুবিধে হয়। সারাদিন মাছের সন্ধানে সাঁতার কাটে। এরা খেতেও পারে প্রচুর। সারাদিন সাঁতার কাটে আর খায়। এদের যাতে কোনো বিপদ না হয় সে ব্যাপারে স্থানীয় অধিবাসীরা সজাগ দৃষ্টি রাখে।

মিসিসিপি উপত্যকায় ও কানাডায় সাদা পেলিক্যান বসবাস করে। এখান থেকে বহু পেলিক্যান আমাদের দেশে শীতের অতিথি হয়ে আসে। এরাও পরিযায়ী হয়। সাদা হলেও এদের ডানার প্রান্তভাগ কালো আর বুকের কাছটা ধূসর। কিছু পেলিক্যান যাযাবর বা পরিযায়ী হয়। এরা কখনো একা, কখনো দুজনে, কখনো-বা দল বেঁধে আকাশে ওড়ে। যখন দল বেঁধে আকাশে ওড়ে তখন দূর থেকে ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতোন দেখায়। কখনো পাশাপাশি, কখনো পিছনে। নয়নাভিরাম এ দৃশ্য যদি ছবির মাধ্যমেও দেখে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই বুঝবেন তা কত সুন্দর, কত অপূর্ব! এই ওড়বার সময় বাতাস এবং ডানার মাখামাখিতে অদ্ভুত সুন্দর একটি শব্দ ছড়িয়ে পড়ে মহাশূন্যে! বাইবেল (জেরোমিয়া ৮:৭) এবং অ্যারিস্টটলের লেখাতে গগনবেড়ের দেশান্তরীর উল্লেখ আছে। শীতে দেশান্তরী হয়ে যায় গরম দেশে। আমাদের শহর কলকাতার চিড়িয়াখানার ঝিলে এরা আসে; আসে সুন্দরবনে ও সংলগ্ন অঞ্চলে। গোলাপি পেলিক্যানের (Pelecanus Onocrotalus) আমাদের দেশে দেখা মেলে না। একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানানো দরকার। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাজ্যের পশ্চিম উপকূলের অদূরবর্তী দ্বীপে, ক্যালিফোর্নিয়া ও আফ্রিকার পশ্চিমস্থ সামুদ্রিক দ্বীপে মাংসাশী পানকৌড়ি, পেলিক্যান পাখির সুবিশাল উপনিবেশ তথা ওই অঞ্চলটি পাখির রাজ্যে পরিণত হয়েছে। কোটি কোটি পাখির বসবাস এখানে। এখানে পাখিদের বিষ্ঠা দিয়ে উত্তম সার প্রস্তুত হয়। পেরু সরকার এই পাখিদের সংরক্ষণ, এদের বিষ্ঠা সংগ্রহ ও প্রসেসিং করার যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। বিনা মূলধনে লাভজনক ব্যবসা। এই সার অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের যা পেরু সরকার রপ্তানি করেছে। অসম্ভব ডিসিপ্লিনড, হৃদয়বান, পরোপকারী, অতিথিবৎসল পাখি হল পেলিক্যান। আর তাই তো তার নামে পেলিক্যান ব্র্যান্ড গিজার, ওয়াটার ফিল্টার, ওয়াটার পাম্প প্রভৃতি আমাদের চোখে পড়ে।

রক্তে ক্যান্সার

ডা. প্রকাশ মল্লিক

লিউকিমোয়া—চলতি কথায় রক্তের ক্যান্সার। কাকে বলে লিউকোমিয়া? জানার আগে রক্ত নিয়ে দু-চার কথা বলে নিই। রক্তে থাকে তিন ধরনের কণিকা—লোহিত রক্তকণিকা (RBC), শ্বেত রক্তকণিকা (WBC) এবং অণুচক্রিকা (Platlet)। থাকে তরল অংশ। রক্তরস বা প্লাজমা, দেখতে যা অনেকটা খড় ধোওয়া জলের মতো। লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে থাকে একধরনের রঞ্জক পদার্থ হিমোগ্লোবিন, যার জন্য রক্তের রঙ লাল। শ্বেত রক্তকণিকার আরেক নাম লিউকোপ্লাস্ট। নিউট্রোফিল, লিম্ফোসাইট, ইয়েসিনোফিল, মনোসাইট, বেসোফিল সহ নানা ধরনের লিউকোসাইট থাকে যাদের কাজ রোগ প্রতিরোধ করা। লোহিত রক্তকণিকার আয়ু প্রায় চার মাস, শ্বেত রক্তকণিকার আয়ু কয়েক ঘণ্টা মাত্র। আর অণুচক্রিকার হল কয়েক দিন।

রক্ত তৈরির কারখানাকে বলে অস্থিমজ্জা বা বোনম্যারো, থাকে হাড়ের ফাঁপা অংশে। অস্থিমজ্জার মধ্যে থাকে আদিম কোষ স্টেমসেল, যেখান থেকে প্রতি সেকেন্ডে তিন মিলিয়ন লোহিত রক্তকণিকা এবং এক লক্ষ কুড়ি হাজার শ্বেত রক্তকণিকা তৈরি হচ্ছে। রক্ত তৈরির এই ফ্যাক্টরিতে গণ্ডগোল হলেই রক্তের নানা অসুখ দেখা দেয়। যার মধ্যে অন্যতম হল লিউকোমিয়া, যার মানে হল সাদা রক্ত। অস্থিমজ্জায় বা রক্তমজ্জায় অসুস্থতার ফলে অতিরিক্ত সংখ্যায় অপুষ্ট এবং অপরিণত নানা ধরনের রক্তকণিকা মজ্জা থেকে রক্তপ্রবাহে চলে আসে এবং নানা বিপত্তি ঘটায়। একেই বলে লিউকোমিয়া। নানা ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা, লোহিত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা—অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে সবকটিতেই। উৎস অনুযায়ী লিউকোমিয়া তাই নানা ধরনের।

লিউকোমিয়াকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। অ্যাকিউট ও ক্রনিক। এদের আবার দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। অ্যাকিউট লিম্ফোয়েড, অ্যাকিউট ম্যালিয়েড এবং ক্রনিক লিম্ফোয়েড ও ক্রনিক ম্যালিয়েড। এদের আবার নানা উপরিভাগ রয়েছে। যেগুলোর আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। লিম্ফোয়েড লিউকোমিয়া হলে রক্তের লিম্ফোসাইট কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধিজনিত ক্যান্সার। আর ম্যালিয়েড লিউকোমিয়া লিম্ফোসাইট বাদে অন্য যে কোনো শ্বেত রক্তকণিকা এবং লোহিত রক্তকণিকা অণুচক্রিকার যে আদি কোষ, তার অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধিজনিত ক্যান্সার।

অ্যাকিউট লিম্ফোয়েড লিউকোমিয়া বা ALL

রোগটা পনেরো বছরের কম বয়সিদের বেশি হয়। বড়দের সাধারণত দেখা যায় পনেরো থেকে পঁচিশ-এর মধ্যে। উপসর্গের মধ্যে রয়েছে জ্বর, দুর্বলতা, রক্তাল্পতা, মাড়ি বা নাক দিয়ে রক্তপাত, কালশিটে দাগ পড়া। পরবর্তীকালে লিভার স্পিন বড় হতে পারে, দেহের নানা জায়গায় গ্ল্যান্ড ফুলতে পারে।

রক্ত পরীক্ষা এবং লাম্বার পাংচার রক্তমজ্জা পরীক্ষা করলেই রোগটা ধরা পড়ে। চিকিৎসা হয় কেমোথেরাপির সাহায্যে। কী ধরনের কেমোথেরাপি, কীভাবে, কতদিন ধরে নিতে হবে—রোগীর বয়স, রোগের তীব্রতা ইত্যাদি দেখে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা ঠিক করেন। রোগটা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে ছড়িয়ে পড়লে অনেক মস্তিষ্কের রেডিয়েশন দিতে হতে পারে।

শিশুদের বেলায় এই রোগ পুরোপুরি সেরে যায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশের, বড়দের বেলায় এই হার মাত্র ২০ থেকে ৪০ শতাংশ। খুব জটিল ধরনের এএলএল ছাড়া এই রোগে বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট বা রক্তমজ্জা প্রতিস্থাপন করা সাধারণত হয়।

লেখক—আন্তর্জাতিক সভাপতি, ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হোমিওপ্যাথি ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক।

অ্যাকিউট ম্যালিয়েড লিউকোমিয়া বা AML

রক্তের লোহিত কণিকা, অণুচক্রিকা এবং লিম্ফোসাইট বাদে অন্য যে কোনো শ্বেতকণিকার ক্যান্সারকে বলে AML।

এটি সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের ক্যান্সার, ২৫ বছরের নিচে খুব একটা হয় না। রক্ত পরীক্ষা এবং লাম্বার পাংচার করে রক্তমজ্জায় পরীক্ষাতে সহজেই রোগটা নির্ণয় করা যায়।

উপসর্গ : ALL-এর মতোই তবে শরীরে ব্যথা যন্ত্রণা বেশি হয়। চিকিৎসা হয় কেমোথেরাপির সাহায্যে, তবে বেশ কড়া ধরনের কেমোথেরাপি অনেকদিন ধরে নিতে হয়। ভাল হওয়ার সম্ভাবনা ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ। তবে বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট করে দারুণ ফল মিলছে AML-এ। এই রোগে প্রচণ্ড খরচ। পুরো কোর্স কেমোথেরাপিতে সব খরচ ধরে ৫-৬ লাখ টাকার প্রয়োজন। ট্রান্সপ্ল্যান্ট হলে বাড়তি খরচ আরও ৮-১০ লাখ টাকা।

ক্রনিক লিম্ফোয়েড লিউকোমিয়া বা CLL

রক্তে লিম্ফোসাইট কণিকা খুব বেড়ে যায়, দেখা দেয় নানা বিপত্তি। এটি বেশি বয়সের রক্তের ক্যান্সার সাধারণ ৬৫ বছরের পর দেখা যায় বেশি হয় পুরুষদের। অনেক সময় পারিবারিক ইতিহাস থাকে। রোগটা হঠাৎ করেই ধরা পড়ে, কোনো কারণে রক্ত পরীক্ষা করতে গিয়ে। ৪০-৬০ শতাংশ রোগীর কোনো উপসর্গই থাকে না। বাড়াবাড়ি পর্যায়ে দুর্বলতা, অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তি, ঘুষঘুষে জ্বর, দেহের নানা স্থানে গ্ল্যান্ড বৃদ্ধি, লিভার এবং স্প্লিন বৃদ্ধি, বারেবারে সংক্রমণ সহ নানা উপসর্গ দেখা দেয়।

রক্তপরীক্ষা এবং রক্তমজ্জা বা বোনম্যারো পরীক্ষা করলেই রোগটা ধরা পড়ে, কোন স্টেজে রয়েছে সেটাও বোঝা যায়। চিকিৎসা হয় নানা ধরনের কেমোথেরাপির সাহায্যে, কখনও স্টেরয়েডের সাহায্যে। অল্পবয়সীদের এই রোগ হলে বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা হয়, বয়স্কদের করলে জটিলতা দেখা দেয়। রেডিওথেরাপির কোনো ভূমিকা নেই এই রোগে। আরেকটি মজার তথ্য হল, কোনো চিকিৎসক ছাড়াই বহু CLL রোগী অন্তত দিব্যি বেঁচে থাকেন।

ক্রনিক ম্যালিয়েড লিউকোমিয়া বা CML

এও এক ধরনের রক্তের ক্যান্সার। রক্তমজ্জায় স্টেমকোষের ক্যান্সার এটা। লিম্ফোসাইট ছাড়াও অন্যান্য শ্বেত রক্তকণিকা, লোহিত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা এই রোগে আক্রান্ত হয়। রোগটা একটু বেশি বয়সে (৫০-৬০ বছর) দেখা যায়। নেপথ্যে রয়েছে জিনের খেলা, যেটি নাম BCR-ABL অনকোজিন। তেজস্ক্রিয়তাও এই রোগের অন্যতম কারণ।

শতকরা ৪০ ভাগ রোগীর কোনো উপসর্গ ছাড়াই রুটিন ব্লাড টেস্ট করতে গিয়ে ধরা পড়ে। অন্যদের দুর্বলতা রক্তাল্পতা, ওজন হ্রাস, খিদে কমে যাওয়া, স্প্লিন এবং বেড়ে যাওয়া সহ নানা উপসর্গ থাকে। বাড়াবাড়ি পর্যায়ে রোগটা অ্যাকিউট ম্যালিয়েড লিউকিমিয়ায় পরিবর্তিত হয়।

সাধারণ রক্ত পরীক্ষা এবং রক্তমজ্জায় বা বোনম্যারো টেস্ট করলে রোগটা ধরা পড়ে, স্টেজিংও বোঝা যায়। আগে এই রোগে ২-৪ বছরের বেশি রোগীদের বাঁচানো যেত না। এখন ‘ইমাটিনিব’ নামে নতুন একটি ওষুধ যেটি শুধুমাত্র মুখে খেতে হয়, দারুণ কাজ দিচ্ছে। প্রায় ৯০ শতাংশ রোগী অন্তত পাঁচ বছর বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকছেন।

অন্যান্য ব্লাড ক্যান্সার

লিউকোমিয়া ছাড়াও আরও কয়েক ধরনের ব্লাড ক্যান্সার আছে। যেমন লিম্ফাটিক সিস্টেম বা লসিকা সংবহনতন্ত্রের লসিকা গ্রন্থির ক্যান্সার লিম্ফোমা। এক বিশেষ ধরনের লিম্ফোসাইটকে প্লাজমা সেল বলা হয়, যার কাজ অ্যান্টিবডি তৈরি করা। এই প্লাজমা সেলের ক্যান্সারকে বলে মায়েলমা। এছাড়া মায়েলোডিসপ্লাসিয়া, মায়েলোপ্রলিফারেটিভ ডিজঅর্ডার , অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিয়া—এগুলোও নানা ধরনের ব্লাড ক্যান্সার।

কেন হয়?

লিউকোমিয়া কেন হয়, এ-ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন জীবাণু বা ভাইরাসের সংক্রমণ, কেউ বলেন এটা বংশগত রোগ, কেউ বা বলেন হরমোন, নানা ধরনের ওষুধ, আঘাত ইত্যাদি এজন্য দায়ী। একমাত্র বড়দের ক্রনিক লিম্ফায়েড লিউকোমিয়া ছাড়া অন্য কোনো ব্লাড ক্যান্সার বংশগতির কোনো প্রভাব পাওয়া যায়নি। আবার এপস্টেইন বা ভাইরাসের সঙ্গে একমাত্র হজকিনস লিম্ফোমার সম্পর্ক পাওয়া গেছে। ধূমপানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে অ্যাকিউট ম্যালিয়েড লিউকোমিয়ার।

বরং নানা রাসায়নিক এবং তেজস্ক্রিয়তার সঙ্গে সব ধরনের ব্লাড ক্যান্সারেরই সম্পর্ক রয়েছে। আর্সেনিক, বেনজিনসহ নানা

রাসায়নিক এখন বিভিন্ন শিল্পে আকছার ব্যবহৃত হচ্ছে। দীর্ঘদিন এগুলো সংস্পর্শে এলে লিউকোমিয়া হতে পারে। তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রতিক্রিয়া কী ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা আমরা হিরোশিমা-নাগাসাকিতে বোমা বর্ষণের পর দেখেছি। অসংখ্য শিশু সেখানে লিউকোমিয়াসহ নানা রোগ নিয়ে জন্মেছে, অকালে মরেও গেছে। ভোপালে তেজস্ক্রিয় গ্যাস লিক হওয়ার পর কী চরম বিপর্যয় ঘটছে, তাও আমাদের স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল রয়েছে। রেডিথেরাপিতে তেজস্ক্রিয় রে দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এই ইউনিটে চরম সতর্কতা অবলম্বন না করলে বিপর্যয় ঘটতে পারে।

সবসময় রোগটা জানান দিয়ে আসে না, রুটিন ব্লাড টেস্ট করতে গিয়ে ধরা পড়ে। তবে বারেবারে জ্বর, ওজন কমে যাওয়া, রক্তাল্পতা, মাড়ি বা দেহের অন্য কোনো স্থান থেকে হঠাৎ করে রক্তপাত হলে, লিভার-স্প্লিনসহ দেহের কোনো গ্ল্যান্ড ফুললে সাবধান হতে হবে। পরামর্শ নিতে হবে চিকিৎসকের কাছে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায়—এইসব রোগের রোগীদের হোমিওপ্যাথিতে চিকিৎসা করালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

প্রতিমায় আবির্ভাব হতে গেলে তিনটি জিনিসের দরকার। প্রথম, যিনি পূজা করবেন তাঁর ভক্তি হওয়া চাই। দ্বিতীয়, প্রতিমার গড়ন সুন্দর হওয়া চাই। তৃতীয়, যাঁর বাড়িতে পূজা হয়, অর্থাৎ গৃহ-স্বামীর ভক্তি হওয়া চাই।

—**শ্রীরামকৃষ্ণ**

প্রত্যেক জীবাত্মাই এক একটা নক্ষত্রস্বরূপ, আর সেই নক্ষত্ররাজি ঈশ্বররূপ সেই অনন্ত নির্মল নীল আকাশে বিন্যস্ত রয়েছে।

—*স্বামী বিবেকানন্দ*

বিয়ের কেনাকাটার জন্য

বেনারসী • ফ্যান্সি শাড়ি • তাঁত শাড়ি
• কাশ্মীরি • শাল • পাঞ্জাবী

ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়

৮২/২-এ, বিধান সরণি (হাতিবাগান), কলকাতা-৪
টাউন স্কুলের বিপরীতে, দূরভাষ : ২৫৫৫-৪০৫১, ২৫৫৫-৬৩৬৮
মোবাইল : ৯৪৩৩০৯৯০৬৩

ডাউন সিনড্রোম ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডা. পার্থসারথি মল্লিক

মানবদেহের প্রতিটি কোষের কেন্দ্রে ক্রোমোজমের ভেতরের ডিএনএ-কে বলা হয় বংশগতির ধারক ও বাহক। মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য যেমন আচার-আচরণ, বুদ্ধিমত্তা, চেহারা, উচ্চতা, গায়ের রং এসব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় ডিএনএ-র মাধ্যমে। তাই ডিএনএ ক্রোমোজমের কোনোরকম অসঙ্গতি হলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক নানা ত্রুটি দেখা দেয়। এগুলোকে বলে জেনেটিক ত্রুটি।

মানবদেহে প্রতিটি কোষে ক্রোমোজমের সংখ্যা থাকে ৪৬টি। ডাউন সিনড্রোম ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রতিটি দেহকোষে ২১তম ক্রমোজোমে একটি অতিরিক্ত ক্রোমোজম থাকে, যাকে 'ট্রাইসমি ২১' বলা হয়। এই অতিরিক্ত ক্রোমোজমটির কারণে বিশেষ কিছু শারীরিক ও মানসিক ত্রুটি নিয়ে ডাউন সিনড্রোম শিশুর জন্ম হয়। ১৮৮৬ সালে ইংল্যান্ডে জন ল্যাংডন ডাউন নামে এক ব্যক্তি এটি আবিষ্কার করেন। তখন থেকেই এটি ডাউনস সিনড্রোম বা শুধু ডাউন সিনড্রোম বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্থান পায়।

কিন্তু সমস্যা হল, ২১তম ক্রোমোজমের অসংগতির ফলে ডাউন সিনড্রোম দেখা দেয়, এটা জানা গেলেও ঠিক কোন কোন কারণে এই অসঙ্গতি হতে পারে, তা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা আজও নিশ্চিত হতে পারেননি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, বিশ্বে প্রতি ৮০০ শিশুর মধ্যে একজন ডাউন সিনড্রোম শিশু জন্মগ্রহণ করে থাকে। পৃথিবীতে প্রায় ৭০ লাখ ডাউন সিনড্রোম লোক রয়েছে।

লক্ষণ : ডাউন সিনড্রোম লক্ষণ নিয়ে জন্ম নেওয়া শিশুদের কিছু শারীরিক ও স্নায়বিক লক্ষণ দেখা যায়। যেমন—এই শিশুগুলো খুব নরম তুলতুলে হয়। লো মাসেল টোনের কারণে শরীরটা একটু ফোলা হয়। অনেকের মধ্যে জিহ্বাটা একটু বের করে রাখার প্রবণতা থাকে। মুখমণ্ডল ছোট হয়, থুতনি সেভাবে বোঝা যায় না, গলা ছোট হয়। এই শিশুদের মাংসপেশির শিথিলতা, বামনতা বা কম উচ্চতা, চোখের কোণ ওপরের দিকে ওঠানো, চ্যাপ্টা নাগ, ছোট কান, হাতের তালুতে একটিমাত্র রেখা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়। কানে কম শোনা, কথা বলতে দেরি হওয়া, কম বুদ্ধি ইত্যাদি জটিলতা হয়। হাঁটাচলা ও মাংসপেশির গঠন সঠিক হয় না। আইকিউ বা বুদ্ধিমত্তা অনেক কম হয়। ৩০ বছর বয়সের পর সমস্যা আরও বাড়ে। অনেক ক্ষেত্রে আক্রান্তরা কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলে। কিছু ক্ষেত্রে আক্রান্তদের অল্পবয়সেই হৃদরোগের সমস্যা হয়। আর কিছু ক্ষেত্রে বয়স বাড়লে হার্টের সমস্যা গুরুতর হয়ে ওঠে। টেস্টিকুলার ক্যান্সার ও লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। দাঁতে সংক্রমণ বা দাঁত পড়ে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। জন্মগতভাবে কিছু রোগ যেমন—অ্যানেটেশ ডিফেক্ট হাইপার অ্যাকটিভিটি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

শনাক্তের উপায় : উন্নত দেশগুলোতে গর্ভবতী মাকে ডাউন সিনড্রোম শিশু এবং অন্যান্য সম্ভাব্য জন্মগত ত্রুটি নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অনাগত শিশুটি ডাউন সিনড্রোম শিশু কি না, রক্তের ক্রোমোজম সংখ্যা বা ক্যারিওটাইপিং পরীক্ষার মাধ্যমেই তা নিশ্চিত হওয়া যায়।

গর্ভাবস্থার ১১ থেকে ১৪ সপ্তাহের মধ্যে প্রাথমিক গর্ভফল থেকে কোষকলা সংগ্রহের মাধ্যমে অথবা ১৫ থেকে ১৮ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভস্থ শিশুর চারপাশের তরলের ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়।

লেখক—বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ও প্রাবন্ধিক।

তখন আল্টাসোনোগ্রামের মাধ্যমে মায়ের রক্ত নিয়ে বা মায়ের পেটের জল, ভ্রূণের টিস্যু ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা করা যায়। এরপর মা-বাবা গর্ভাবস্থা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আশার কথা যে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখন আমাদের এখানেই করা যায়।

করণীয় : ডাউন সিনড্রোম কোনো রোগ নয়, তাই এটি নিরাময় হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে সঠিক সময়ে লক্ষণগুলো চিহ্নিত করে সঠিক পরিচর্যা, পুষ্টিকর খাবার, স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ ও ফিজিক্যাল থেরাপি দিলে তারা অন্য স্বাভাবিক শিশুর মতো পড়ালেখা করে কর্মক্ষম বা স্বনির্ভর হতে পারে অথবা প্রয়োজনীয় পরিচর্যায় শারীরিক সমস্যাগুলো কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। মনে রাখতে হবে, ডাউন সিনড্রোম প্রতিরোধের কোনো উপায় নেই। মায়ের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাউন শিশু হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে অধিক বয়সে, বিশেষ করে ৩৫ উর্ধ্বে বয়সে মা হওয়াকে নিরুৎসাহিত করা হয়। পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ রোধসহ গর্ভবতী মায়ের উচিত ভেজাল খাদ্য ও ভেজাল প্রসাধনী বর্জন করা, তেজষ্ক্রিয়তা এড়িয়ে চলা ইত্যাদি। এসব কারণে ডাউন শিশুর জন্ম হতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা : আমার বাবা ডা. প্রকাশ মল্লিক একজন প্রবীন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। বাবার কাছে ডাউন সিনড্রোমের রোগী আসে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তার কুড়ি শতাংশের উন্নতি হতে দেখেছি, বাবা বলেন—এই রোগীর 'বাবা-মা' যখন পরবর্তী সন্তানের কথা চিন্তা করবেন সেক্ষেত্রে যদি গর্ভাবস্থা থেকে চিকিৎসা করা যায় তবে সেক্ষেত্রে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

With Best Compliments From :

SANCHAYAN

Publisher & Book Sellers

16/1, Shyama Charan Dey Street
Kolkata-700 073
Phone : 9830270305

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা—A. I. কী?

অধ্যাপক দেবাশিস দত্ত

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলতে যন্ত্রের মানুষের মতো আচরণ করার ক্ষমতা বোঝায়। প্রাথমিকভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এমন একটি প্রযুক্তি হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল যা মানুষের বুদ্ধিমত্তার অনুকরণ করতে পারে, কিন্তু এটি অনেক উপায়ে বিকশিত হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের কার্য গ্রহণ করতে পারি ও সংযোগ এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষমতা দ্রুত প্রসারিত হয়েছে এবং এই কারণে এর উপযোগিতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, শিল্পবিপ্লব 4.0 নামেও পরিচিত, বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী?

এটি কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি শাখা যার লক্ষ্য মানুষের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কম্পিউটার বা যন্ত্র তৈরি করা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলতে চিন্তাভাবনা, সিদ্ধান্ত নেওয়া, শেখা ও সমস্যা সমাধানের মতো মানুষের বুদ্ধিমত্তার প্রক্রিয়াগুলিকে যান্ত্রিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত করা বোঝায়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হল একটি জটিল প্রযুক্তি যা কম্পিউটারে একটি নির্দিষ্ট তথ্য প্রবেশ করানো এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হল স্ব-শিক্ষার নিদর্শন তৈরি করা যা কম্পিউটারকে মানুষের মতো প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করবে।

MIT, USA-এর John Mcarthy 1956 সালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালু করেছিলেন, বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সামরিক ব্যবস্থা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রয়োগের কারণে প্রাধান্য পেয়েছে।

ভারতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব :

শিল্প বিশ্লেষকদের মতে, ২০২৫ সালের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাজার ভারতের অর্থনীতিতে 957 Billion যোগ করতে পারে। সরকারি ও বে-সরকারি সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই ভারতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিভাগকে শক্তিশালী করার জন্য অনেকগুলি প্রকল্প ও উদ্যোগ শুরু করেছে, যা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে।

ভারত সরকার ২০২০ সালের মে মাসে ভারতের জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওয়েব-পোর্টাল চালু করেছে, যা দেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কিত উন্নয়নের জন্য এক জানালা ডিজিটাল মঞ্চ, এই পোর্টালটি একটি জ্ঞান বণ্টনের মাধ্যমের মতো ব্যবহৃত হয় যা ব্যবহারকারীদের ব্যবহারের জন্য নথি, নিবদ্ধ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যযুক্ত করে। তাছাড়া এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চাকরি সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার একটি মঞ্চ হিসাবে কাজ করে।

ভারত সরকার যুব কর্মসূচির জন্য দায়বদ্ধ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও চালু করেছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল তরুণ ছাত্রদের একটি মঞ্চ দেওয়া যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নতুন প্রযুক্তির মানসিকতা তৈরি করা ও তাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা। এই প্রকল্পের অধীনে সারা দেশ থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি বিদ্যালয়ের নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর কম্পিউটারভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিতে পারবে। শিক্ষার্থীদের চলমান ছবির (Video) মাধ্যমে তাদের সমাধান জমা দিতে হবে এবং জমা দেওয়ার পর তারা প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ পাবে।

লেখক—বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক।

ভারতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে প্রতিকূলতা :

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবস্থাপনা স্থাপন ও গঠনে দক্ষতা ও প্রতিভার অভাব। একটি সমীক্ষা অনুসারে ভারতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পেশাদারদের মধ্যে মাত্র 4%-এর গভীর শিক্ষা রয়েছে, তাছাড়া এই ক্ষেত্রে খুব বেশি গবেষক নেই।

ব্যবহারকারীদের মধ্যে সহযোগিতার অভাব রয়েছে, উপরন্তু, একটি বড় উদ্বেগ আছে যা নিরাপত্তা বা তথ্যের গোপনীয়তা।

নবীনদের পক্ষে আগে থেকে তৈরি করা সমাধান দেওয়া সহজ নয় যা Google বা facebook মতো বড় বাজারের খেলোয়াড়দের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক পরিষেবাগুলির প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও স্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটারের পরিকাঠামো তৈরি করা ও উচ্চ ব্যয়ের অভাব।

অধিকাংশ সরকারি/বেসরকারি সংস্থার ব্যবসা-সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান সচেতনতার অভাব। এই সমস্যাটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পেশাদারদের অভাবের দিকে পরিচালিত করেছে যা ভারতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করেছে।

বিশ্বের অগ্রগতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা :

প্রয়োগকৃত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশ্বের সকল দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপকভাবে অবদান রাখে। আশা করা হচ্ছে যে আগামী দিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সবচেয়ে বড় বস্তু হয়ে উঠবে এবং এটি মানুষের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন এমন বেশিরভাগ ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশ্বব্যাপী পরিষেবার ক্ষেত্রে সুবিধা যোগ করতে প্রমাণিত হয়েছে এবং বিভিন্ন সংস্থার জন্য এটি একটি মূল অস্ত্র হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ নিম্নরূপ :

স্বাস্থ্যসেবা : এই বিভাগে উচ্চ উদীয়মান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারগুলির মধ্যে কয়েকটি হল ব্যক্তিগত চিকিৎসা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত রোগ নিরূপণ করা ও সম্ভাব্য মহামারি শনাক্তকরণ।

কৃষি : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খাদ্য বিপ্লবকে চালিত করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার, অপর্যাপ্ত চাহিদার পূর্বাভাস ও নিশ্চিত সেচের অভাবের মতো অনেক সমস্যা মোকাবেলা করে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, কীটপতঙ্গের আক্রমণ শনাক্তকরণ, ফসলের মূল্য নির্ধারণ ও যুগোপযোগী উপদেশ প্রদানের ব্যবস্থা করা যায়।

খুচরো : খুচরো খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চিত্রভিত্তিক অনুসন্ধান, ব্যক্তিগতকৃত পরামর্শ, পছন্দভিত্তিক ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদান করে। এটি প্রাথমিক পরিচালন ব্যবস্থা ও সময়-অনুযায়ী পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থা উন্নত করে ও গ্রাহকের চাহিদার প্রত্যাশা পূরণ করে।

পরিবহণ : পরিবহণ বিভাগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারগুলির মধ্যে রয়েছে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, বিতরণ ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যৎ-বাণী মূলক ইঞ্জিনের পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।

নির্মাণ : নির্মাণ শিল্পে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিতরণ পরিচালন ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, উৎপাদন, গুণমান নিশ্চিতকরণ ও গুদামজাত করণকে প্রভাবিত করে।

উন্নত শহরগুলিতে : ক্রমবর্ধমান শহরগুলিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্রুত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করে। উন্নত ভিড় ব্যবস্থাপনা, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও যানজট কমানো হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যবহার।

শক্তি : অনাকাঙ্ক্ষিকতা কমাতে শক্তি ব্যবস্থার পূর্বাভাস এবং পূর্ণবিন্যাসের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত। শক্তিক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দক্ষতা বৃদ্ধি ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। বুদ্ধিমান গ্রিডে থাকা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মিটার সৌরশক্তির নির্ভরযোগ্যতা ও সামর্থ্যকে উন্নত করে।

শিক্ষা ও দক্ষতা : সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রবর্তন স্বয়ংক্রিয়, ব্যক্তিগতকৃত শেখার, প্রশাসনিক কাজগুলি সহজতর করার মাধ্যমে আরও ভাল শেখার অভিজ্ঞতার সমাধান প্রদান করে ও ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আর্থিক : এটি ব্যক্তিগত অর্থায়নের জন্য ব্যবহারগুলিতে চালু করা যেতে পারে ও ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে ও আর্থিক পরামর্শ সরবরাহ করতে পারে।

কম্পিউটার গেম : দাবা, জুজু, টিকটক ইত্যাদির মতো কৌশলগত খেলাগুলিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি মূল ভূমিকা

পালন করে যেখানে যন্ত্রটি প্রচেষ্টা ও ভুল (Trial & Error) বোঝার উপর ভিত্তি করে একটি বড় পরিমাণ সম্ভাব্য অবস্থান বিবেচনা করতে পারে।

আইন : আইন বিশ্লেষণের সময় ব্যয় হ্রাস করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুলতুবি থাকা দৃষ্টান্তগুলির দ্রুত সমাধান করতে পারে, যার ফলে সময়ের ব্যবহার ও কার্যকারিতা উন্নত হয়।

বুদ্ধিমত্তা : Automation হল একটি প্রক্রিয়া (System) স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনা করার পদ্ধতি। যন্ত্রমানবগুলিকে (Robot) বৃহৎ, পুনরাবৃত্তিযোগ্য দায়িত্ব পরিচালনার জন্য নির্দেশাবলী দেওয়া যেতে পারে, যা সাধারণ মানুষ সম্পন্ন করে এবং তাদের তৎপরতা ও পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে অভিযোজিত হওয়ার কারণে। স্নায়ুগুলির কারণে যন্ত্রমানব, মানুষের কার্য সম্পাদন করতে পারে, যা বাস্তব জগতের আলো, তাপমাত্রা, গতি, শব্দ, ধাক্কা ও চাপের মতো শারীরিক তথ্য শনাক্ত করতে পারে। উপরন্তু এরা কার্যকর প্রসেসর, অসংখ্য স্নায়ু ও একটি বিশাল স্মৃতিসহ বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করে। এরা তাদের ভুল থেকে শিখতে পারে এবং নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারে।

নিরাপত্তা : ভারতে ২০তম বৈদ্যুতিন গভর্নেন্স সম্মেলনে এটি আলোচিত হয়েছিল যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সাইবার নিরাপত্তা বাড়ানো যেতে পারে এবং এটি অন্বেষণ করতে হবে।

কথা শনাক্তকরণ (Speech Recognition) : এটিতে এমন একটি বুদ্ধিযুক্ত প্রক্রিয়া রয়েছে যা শব্দ এবং অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা শুনতে ও বুঝতে পারে যখন মানুষ এটির সাথে কথা বলে। এটি বিভিন্ন উচ্চারণ, অশ্লীল শব্দ, পটভূমির শব্দ, ঠাণ্ডার কারণে মানুষের স্বর পরিবর্তন ইত্যাদি পরিচালনা করতে সক্ষম।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গ্রহণের উপর বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি :

USA ও চিন আশা করে যে তাদের GDP-এর যথাক্রমে 10% ও 26% ২০৩০ সাল নাগাদ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত ব্যবসা ও ক্রিয়াকলাপ থেকে উৎসাহিত হবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা উন্নয়নের জন্য বৃহত্তর পরিবেশ ব্যবস্থা তৈরি করতে, বিভিন্ন দেশ দ্বারা পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

দেশগুলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তরঙ্গের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং এর জন্য এই দেশগুলি একটি কর্মীবাহিনী তৈরি করেছে ও বিজ্ঞান, গণিত ও প্রকৌশলের জন্য তাদের সম্পদের বরাদ্দ বাড়াচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সীমাবদ্ধতা :

মানব শ্রমের বিরুদ্ধে : উৎপাদন ও পরিষেবা শিল্পগুলিতে যন্ত্রপাতি ও বুদ্ধিমান যন্ত্রমানবের আবির্ভাব মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস করছে যা ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য একটি গুরুতর সমস্যা যেখানে কর্মসংস্থান তৈরি করা একটি বড় সমস্যা।

উদাহরণস্বরূপ কিছু শুল্ক কর্মকর্তারা এখন চিন/জাপানের তৈরি যন্ত্রমানবগুলির উপর আরো বেশি দৃষ্টিনিক্ষেপ করছে।

অস্তিত্বগত ঝুঁকি :

বিজ্ঞানী Stifen Hockings একবার বলেছিলেন, 'সম্পূর্ণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ মানবজাতির সমাপ্তি চিহ্নিত করতে পারে।'

মানুষ যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরি করবে, তখন তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করবে এবং ক্রমবর্ধমান গতিতে নিজেদের নতুনভাবে পরিবর্তিত করবে।

ধীর জৈবিক বিকাশ দ্বারা বাধাগ্রস্ত মানুষেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না এবং তারা প্রতিস্থাপিত হবেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কৌশলগুলি যেগুলি সন্ত্রাসবাদীদের হাতে পড়বে সেগুলি মানবজাতির অস্তিত্বের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে।

এটি মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক হ্রাস করতে পারে, যার ফলে সমাজ নৈতিকভাবে অবক্ষয় হতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শক্তিকে ব্যবহার করার পথ :

বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত দেশগুলির মধ্যে নিজেকে উচ্চভাবে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ ভারতের রয়েছে। এখানে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি যা ভারতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাঠামোকে শক্তিশালী করবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণা : মূল ও ফলিত গবেষণা উভয়ই যে কোনো বুদ্ধিমান প্রযুক্তির বাণিজ্যকরণ ও ব্যবহারে সহায়তা করে। ভারতে একটি কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তার কৌশল তৈরি করতে প্রচুর পরিমাণে উৎসর্গ ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

দ্রুত গ্রহণ : তথ্য নির্দেশ করে যে ভারতীয় সংস্থাগুলির মাত্র 22% তাদের ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে। এটি নির্দেশ করে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গ্রহণ ধীরগতিতে হয়েছে। সরকারকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রচারের দিকে পদক্ষেপ নিতে হবে নতুবা বিশ্বব্যাপী মানচিত্রে ভারত তার অবস্থান হারাবে।

গোপনীয়তা, নৈতিকতা, নিরাপত্তা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা :

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিগত বিবর্তনের একটি পথ হতে চলেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রাম ও যন্ত্রের উপর নির্ভরতা কখনও গভীর ছিল না। তবে এই নির্ভরতার সাথে একজনের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি আসে। তাই এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপগুলি অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত।

Dark-Web ও কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তা সম্পর্ক :

ডার্ক ওয়েব একটি বেনামি পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত ওয়েব-পৃষ্ঠা যেখানে অপরাধমূলক বাজারগুলি বিজ্ঞাপন ও মাদক, অস্ত্রপাচার ইত্যাদি বিভিন্ন অপরাধীদের বিক্রি করে। অনেক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এই কার্যক্রমগুলি বন্ধ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে তবে ডার্ক ওয়েবের পেছনে বাস্তব বিশ্বের লোকদের তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হয়। তবে প্রযুক্তির উন্নতি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্থানের ফলে সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

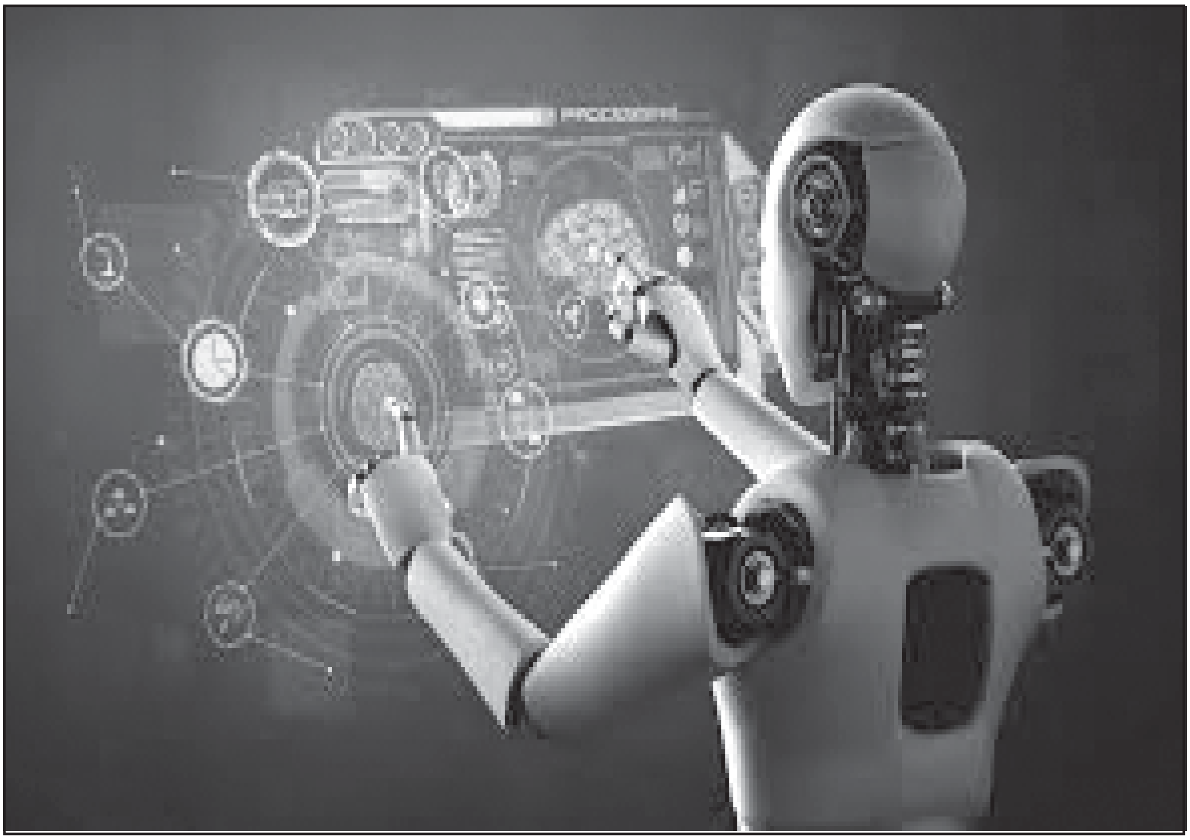

● কৃত্রিম বুদ্ধিমান।

সৌন্দর্য শোভা অরুণাচল

উদয়াচলের পথে

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির নৈসর্গিক শোভার খ্যাতি চিরন্তন। পথের দুর্গমতা উপেক্ষা করে সেই আকর্ষণে পর্যটকরা ছুটে চলেন তার বিভিন্ন অংশে। এদের মধ্যে অরুণাচল প্রদেশ অন্যতম। উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সালে অরুণাচল প্রদেশ ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা লাভ করে, যদিও ১৯৭২ সাল থেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে এই বিতর্কিত ভূখণ্ডের আত্মপ্রকাশ। তবে স্বাধীনতার পর থেকে এই অঞ্চল NEFA নামেই ভারতবাসীর কাছে অধিক পরিচিত ছিল। এবার আমাদের গন্তব্যস্থল সূর্যোদয়ের পথে অর্থাৎ উদয়াচল। হ্যাঁ, অতীতে এই নামেই অরুণাচলকে অভিহিত করা হয়েছে।

অরুণাচল প্রদেশের বৃহত্তর অংশ চিন, ভুটান ও মায়ানমার এই তিন বিদেশি রাষ্ট্র দ্বারা বেষ্টিত। অন্যদিকে আসাম রাজ্য। এর প্রবেশদ্বারও বটে। যদিও অরুণাচলের অনেকাংশই অতীতে তিব্বতের অধীন ছিল। এরপর থেকে নানা ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী আজকের অরুণাচল প্রদেশ।

উত্তরে তুষারাবৃত গগনচুম্বি হিমালয়। দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা। এর মধ্যবর্তী ৬০ শতাংশের বেশি অংশে চিরহরিৎ বনাঞ্চল ও বেগবতী পাহাড়ি নদী, যা অরুণাচল প্রদেশকে রহস্যময় করে তুলেছে। তবে হাজারো প্রজাতির অর্কিড, বিভিন্ন ঋতুতে বর্ণময় ফুলের বাহার, পাহাড়ের কোলে স্বচ্ছ জলের হ্রদ, সবুজ বনানীর বুক চিরে নেমে আসা রূপালী ঝরনা, মেঘেদের নিরলস অভিযান—অরুণাচলের নৈসর্গিক শোভায় অন্য মাত্রা যুক্ত করেছে। আর চলার পথে পদে পদে রয়েছে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি। তাই প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটকদের কাছে পছন্দের অন্যতম ঠিকানা অরুণাচল প্রদেশ।

এবার অরুণাচল প্রদেশের কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আমাদের পা রাখার ভাবনা। অবশ্যই সেগুলো ভ্রমণপিপাসুদের কাছে দর্শনীয়। আর পরিচিত হব এই পার্বত্য এলাকার প্রকৃতি, উপজাতিদের জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি ও বৌদ্ধমঠগুলির সঙ্গে।

সময় অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ। বর্ষা শেষ। হিসেবমতো শরৎকাল। সতেজ সবুজ বনাঞ্চল। ঝরনার স্ফীতকায় জলধারা। ভরা নদী ক্ষুরধার। আর ভাসমান সাদা মেঘের ফাঁকে নীলাকাশ—এই নিয়েই তো শরতের হিমালয়। এই আকর্ষণেই আমাদের চলা উদয়াচলের পথে।

তবে ইদানিং বর্ষার বিদায়লগ্নেও শিবালিক হিমালয়ের কোথাও কোথাও মেঘভাঙা বৃষ্টি, ভূমিধস, পাহাড়ি নদীতে প্লাবন বা হড়পা বান প্রভৃতি বিপর্যয় লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রকৃতির খেয়ালে মানুষ বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। তবু ভ্রমণপিপাসু মানুষ তাকে জয় করার ইচ্ছায় বুকে সাহস নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে। আমরাও সবকিছু মানিয়ে নেওয়ার সংকল্প করে ২০২৩-এর ৫ই অক্টোবর বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম উদয়াচলের পথে।

কয়েকজন সহযাত্রীর সময় অভাবের জন্য আমাদের কলকাতা থেকে গৌহাটি পর্যন্ত আকাশপথেই যেতে হবে। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে উড়ান সকাল সোয়া ছটায়। আগের দিন মাঝরাতে বৃষ্টি ঝরার আওয়াজ কানে পৌঁছনোয় একটু বিচলিত হলাম। অবশ্য ভোরে বাড়ির থেকে বের হওয়ার সময় আকাশ মেঘলা হলেও বৃষ্টি পড়েনি। তাতে চিন্তামুক্ত হয়ে অন্তত বাড়ি থেকে বের হওয়া গেল।

ভোরের ফাঁকা রাস্তা। কোথাও কোনো বাধা নেই। দ্রুত নির্ঝঞ্ঝাটে বিমানবন্দরে পৌঁছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ সেরে

লেখক—বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও ভ্রমণ বিষয়ক লেখক এবং গ্রন্থকার।

● পাহাড়ি জনপদ।

● কামেং নদী।

আমরা বিমানে ওঠার অপেক্ষায় বসে থাকলাম। নির্দিষ্ট সময়েই বিমান ছাড়ল। জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে। তবে শেষরাতের ঘুম লেগে থাকায় বেশিক্ষণ আর চোখ মেলে থাকা সম্ভব হল না। সোয়া এক ঘণ্টার যাত্রা। ঝিমোনোর মধ্যেই হঠাৎ কানে এল বিমানবালার মধুর কণ্ঠস্বর। জানা গেল, আমরা অল্পকিছু সময়ের মধ্যেই গৌহাটি বিমানবন্দরে অবতরণ করছি। এবার চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলাম।

গৌহাটি বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে দেখি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সাথে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। থিকথিকে জল পেরিয়ে গাড়ি অবধি পৌঁছতে হবে। মনের আকাশেও মেঘ জমে গেল। যদিও আমাদের গন্তব্যস্থলের দূরত্ব অনেকটাই।

কলকাতা থেকেই ন'দিন ভ্রমণের জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ড্রাইভারের নাম, ফোন নম্বর, গাড়ির নম্বর সব আগেই জানা ছিল। বেরিয়ে ফোন করার সাথে সাথে সে আমাদের কাছে পৌঁছে যায়। আমরা সময় নষ্ট না করে সাড়ে আটটা নাগাদ গৌহাটি বিমানবন্দর চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের গন্তব্যস্থল ভালুকপং। আসাম-অরুণাচল প্রদেশ সীমান্ত। দূরত্ব প্রায় ২৪০ কিমি।

শহরের বাইরে হাইওয়ের ধারে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ভালোমতো জলযোগ সেরে নিলাম। পরে কোথায় কী পাওয়া যাবে না যাবে তা তো অজানা। তেজপুরের কাছাকাছি যেতে আবহাওয়া পরিষ্কার হতে শুরু করল এবং গাড়িও মসৃণ পথ ধরে দ্রুত এগিয়ে চলল। পথের ধারে একটি উন্নতমানের ধাবা দেখে দুপুরের খাওয়া সেরে নেওয়া হল। বাঙালি খানা। মন্দ নয়।

নামোরি অভয়ারণ্যের পাশ দিয়ে চলেছি। কোথাও কোথাও জিয়াভরলী নদীর সঙ্গে দেখা হচ্ছে। অবশেষে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ভালুকপং পৌঁছতে বিকেল ৪টে বেজে গেল। গাড়ি আসাম সীমান্তে রেখে তাড়াতাড়ি অরুণাচলের ILP অফিসে যোগাযোগ করা হল অনুমতিপত্রের জন্য। অরুণাচল প্রদেশ ভ্রমণের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা ভালুকপংয়ে যে হোটেলে থাকব, কলকাতা থেকে আমাদের ছবি, পরিচয়পত্র পাঠিয়ে তাদের মাধ্যমে ILP সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিলাম। সেইমতো হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা ILP সংগ্রহ করে গাড়ি নিয়ে অরুণাচল প্রদেশে প্রবেশ করলাম। আগে থেকে বন্দোবস্ত করে রাখায় আমরা সত্বর 'হোটেল সিগাল'-এ পৌঁছে গেলাম।

ভালুকপং চেকপোস্ট থেকে সামান্য দূরে পাহাড়ের কোলে হোটেল সিগাল। সেখানে ঢুকেই কর্মচারীদের কাছে আগে গরম চায়ের আবদার করে দেহটাকে নিশ্চিন্তে সোফায় এলিয়ে দিলাম। প্রায় বারো ঘণ্টার লড়াইয়ের অবসান। তবে গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে পাহাড়ি জনপদে হোটেলের নাম সিগাল দেওয়ার কারণটা খুঁজতে লাগলাম কিন্তু পেলাম না।

দোতলায় নির্ধারিত ঘরে ঢুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি বিকেলের শেষ আলোয় তখনও সবই দৃশ্যমান। কাছেই পাহাড়। উপরের অংশে মেঘগুলো সাময়িক বিশ্রাম নিচ্ছে। নীচের অংশে জঙ্গলাকীর্ণ পথে গাড়ি চলাচল লক্ষ করা যাচ্ছে। আমাদের হোটেলের সামনে দিয়ে রাস্তাটা ঘুরে ঘুরে ওই পথ ধরে অন্য ঠিকানায় চলেছে। অবশ্য আগামীকাল সকাল অবধি আমাদের ঠিকানা এই হোটেল সীগালই।

সারাদিনের ক্লান্তি জড়ানো শরীরে আর নড়বার ইচ্ছা নেই। ঘরে বসেই আগামী সফরসূচি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে রাত গড়িয়ে গেল। রাতের খাবার ঘরে দেওয়ার কথা জানানো হল। তবে ঠাণ্ডা তেমন অনুভূত হচ্ছে না। এখন শোওয়ার জন্য সকলেই উদগ্রীব হয়ে রয়েছে।

পরদিন অরুণাচলে প্রথম ভোরের সাক্ষী হওয়ার লোভে দরজা খুলে মন খারাপ হয়ে গেল। সূর্য দেখার পরিবর্তে মেঘের দেখাই পেলাম। অবশ্য আমরা সকলেই ভালুকপং ছেড়ে অরুণাচল প্রদেশের আরও উপরের দিকে পা রাখব। তাতে আবহাওয়ার পরিবর্তন সম্ভব কি না, তা সময়ই বলবে।

আজ আমাদের গন্তব্যস্থল দিরাং। সকাল নটা নাগাদ স্নান জলখাবার সেরে হোটেল সিগাল ছেড়ে বের হচ্ছি ততক্ষণে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। হোটেলের কর্মচারীরা জানাল, সামনের পাহাড়টা ছাড়িয়ে গেলে হয়তো আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। সেই আশ্বাসে আমরা গাড়িতে উঠে পড়লাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কামেং নদীর পাশ দিয়ে পাহাড়ি পথ ধরে গাড়ি এগিয়ে চলল। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। মাথার উপর দিয়ে মেঘেদের ঠিকানা বদল চলছে। কখনও কখনও একপশলা বৃষ্টিও ঢেলে দিচ্ছে। তবে মেঘেদের সঙ্গে নিয়ে আঁকাবাঁকা চড়াই-উতরাই পথ পাড়ি দিতে মন্দ লাগছিল না।

চলতে চলতে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায় সদ্যনির্মিত ১৬৫০ ফুট দৈর্ঘ্যের 'নেচিফু সুড়ঙ্গ' পথ অতিক্রম করতে হল। আমরা সুড়ঙ্গপথ প্রবেশের মুখে গাড়ি থেকে নেমে চাক্ষুষ

করলাম। আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি। যান চলাচলের পাশে দু'ধারে উঁচু ফুটপাত। পর্যাপ্ত আলো। অত্যাধুনিক নকশাটাও ভারি সুন্দর।

দেখা গেল, নেচিফু সুড়ঙ্গ সংলগ্ন এলাকা অত্যন্ত কুয়াশাচ্ছন্ন। এবং জানা গেল এটাই এই অঞ্চলের স্বাভাবিক অবস্থা। সারাবছর এমনই থাকে। সত্যিই, এই পথে গাড়ি চালানো ও গাড়ি চড়া—দুটোতেই মনের জোর চাই। ঘন জঙ্গল, পাহাড়ি খাদ, তার উপর কুয়াশায় দৃশ্যমানতা খুবই কম।

আমরা দুপুর দুটো নাগাদ অরুণাচলের ঐতিহাসিক শহর বোমডিলায় প্রবেশ করলাম। যদিও আমরা এখন বোমডিলায় থাকব না। সাময়িক বিরতি। দুপুরের খাওয়ার জন্য একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে কয়েকজন বাঙালির সঙ্গে পরিচয় হল। তারা পর্যটক নন। কোনো বড় প্রজেক্টে কর্মরত। রেস্তোরাঁয় ম্যানেজার থেকে কর্মচারী—সকলেই মহিলা। সকলেই বাংলা ভাষা বুঝতে পারছে এবং টেনে টেনে হাসিমুখে বাংলা ভাষা বলতেও পারছে। এটাও কম পাওনা নয়।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে দেখি মেঘ প্রায় মাথায় ঠেকে যাওয়ার মতো অবস্থা। অসময়ে গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে। আমাদের গন্তব্যস্থল 'দিরাং' প্রায় ৪৫ কিমি। এই অবস্থায় পথ চলতে হবে। ড্রাইভার রিয়াজের দিকে বিস্ময়বোধক দৃষ্টিতে তাকাতে, সে একটা চওড়া হাসি দিয়ে আশ্বস্ত করল। হ্যাঁ, তার উপর ভরসা করেই তো চলেছি। তাই কপাল ঠুকে গাড়িতে উঠে পড়লাম।

ঘন বনাঞ্চলের পাশ দিয়ে মেঘে ঢাকা পাহাড়ি পথ। কোথাও কোথাও বৃষ্টিও সঙ্গী হচ্ছে। গাড়ির হেডলাইটগুলো পথকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে। এই অবস্থায় দমবন্ধ করে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের যাত্রা শেষ করে বিকেল চারটে নাগাদ আমরা দিরাং পৌঁছলাম।

অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম কামেং জেলায় প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ছোট্ট সুন্দর একটা জনপদ দিরাং। জনপদের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে কামেং নদী। আমাদের অস্থায়ী ঠিকানা 'হোটেল পেমলিং'। হোটেলের আবরণে খুব বেশি আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। তবে সাবেকি ঐতিহ্য আছে। ঘরের বেশিরভাগ অংশই কাঠের এবং সুদৃশ্য নকশা করা। অনেকটা জায়গা নিয়ে হোটেলের অবস্থান। সংলগ্ন বাগান ফুল-ফলের গাছে সজ্জিত। ঘরের জানলা দিয়ে মনোরম উপত্যকার অনেকটা অংশই দেখা যাচ্ছে।

নদীর দুপারে বসতি ও চাষ-আবাদ। পাহাড়ের গায়ে ফাঁকা ফাঁকা ঘর-বাড়ি। গাছগাছালির মধ্য দিয়ে মাথা তুলে উঁকি দিচ্ছে কয়েকটা বৌদ্ধমঠ। ঘরে বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে হঠাৎ কাচের জানালা ভেদ করে দৃষ্টি চলে গেল পাহাড়ের মাথায়। পড়ন্ত সূর্যের একফালি রশ্মি সেখানে যেন তিলক পরিয়ে দিয়েছে। দৃশ্যটা যতটা সুন্দর, ততটাই আমাদের কাছে উৎসাহব্যঞ্জক।

সন্ধেটা ঘরে বসে গল্পে গল্পে কাটানো হল। ঠাণ্ডা কম অনুভূত হওয়ায় ডাইনিং হলে গিয়ে রাতের খাবার সেরে নিলাম। জায়গাটা ভারি সুন্দর। একটা দিক পুরোটাই কাচ দিয়ে ঢাকা। সেখান দিয়ে রাতের দিরাং উপত্যকা দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে জনপদের আলোগুলো যেন আকাশের নক্ষত্রের মতো দেখতে লাগছে। সুস্বাদু খাবারের সঙ্গে এ দৃশ্য আমরা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে লাগলাম।

পরদিন সকালে গরম চায়ে চুমুক দিয়ে হোটেলের বাগান দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। ফল, ফুল ও নানারকম অর্কিডে সাজানো বাগান। তার মধ্যে নজর কাড়ছে পাকা 'পারসিমান' ফলগুলো। ঠিক যেন বড় বড় পাকা টমেটো। খেতে খানিকটা আপেলের মতো। বেশ সুস্বাদু। অরুণাচল প্রদেশে এই জাপানি ফলের চাষ ভালোই হচ্ছে। মালকিন বাগানে ঘোরাঘুরি করছিলেন। কৌতূহল প্রকাশ করায় হাসিমুখে নিজের হাতে পেড়ে আমাদের দুটো দিলেন। পরে আমরা দু' কেজি কিনেও নিলাম, পথচলতি খাওয়ার জন্য।

হোটেল থেকে স্নান ও কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট সেরে একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম 'তাওয়াং'-এর উদ্দেশে। দীর্ঘ পথ। দূরত্ব প্রায় ১৪৫ কিমির মতো। তাছাড়া পথে কয়েকটা দর্শনীয় স্থান ঘুরে আমরা তাওয়াং-এ ঢুকব।

দিরাং শহর থেকে কিছুটা দূরে একটা উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। তার আকর্ষণে শতাধিক সিঁড়ি ভেঙে বনপথ ধরে ওঠানামা করতে হবে। এ পথেই ছোট-বড় কয়েকটা প্রাচীন বৌদ্ধমঠ আছে সেগুলো দেখে আমরা একটা ছোট্ট গ্রামে পৌঁছলাম। একসময় এটা দুর্গ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আবার এটাকে জেলখানা হিসেবে ব্যবহার করাও হয়েছে। সেই অর্থে বর্তমানে একে ঐতিহ্যবাহী গ্রাম বলে মনে করা হয়।

বেশ খানিকটা তাওংয়ের দিকে এগিয়ে যেতেই বুঝলাম এ পথে শরতের হিমালয়ের রূপলাবণ্য দেখার আশা করাই বৃথা। বলা ভালো বঙ্গের বর্ষার চলমান প্রতিচ্ছবি। চলার পথে ঘন

সবুজ বনাঞ্চলে গাছের ফাঁক দিয়ে নীচের খরস্রোতা নদীর প্রবাহ দেখা যাচ্ছে। আর সেনাবাহিনীর গাড়ি ও পথের ধারে তাদের ছাউনি। চড়াই পথে ঘুরে ঘুরে উঠছে। অবশেষে ১৩৭০০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট 'সেলা টপ' পেরিয়ে আমরা তাওয়াং জেলায় প্রবেশ করলাম।

কুয়াশাচ্ছন্ন ও কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যেই সেলা পাসে আমাদের সাময়িক বিরতি। একেবারে পথের ধরেই সেনাবাহিনীর জওয়ানরা নিঃশুল্ক গরম চা ও কফি নিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করছেন। এই পরিবেশে যা অত্যন্ত আনন্দদায়ক। হাত বাড়ানোর আগেই হাতে পৌঁছে গেল।

পাশেই ১৯৬২ সালে চিনের যুদ্ধে ব্যবহৃত বাঙ্কারগুলো আজও দেখা যাচ্ছে। ওখানেই বীর শহিদ জওয়ান যশবন্ত সিংহের সাহসী আত্মত্যাগের স্মৃতিতে নির্মিত 'যশবন্ত গড়' দেখে নিয়ে সেনাবাহিনীর ক্যান্টিনে গরম ন্যুডল স্যুপের স্বাদগ্রহণ করে আমরা আবার এগিয়ে চললাম।

তাওয়াং-এ ঢোকার পর থেকে হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। বৃষ্টির ধারাপাত কিছুক্ষণ আগেই বন্ধ হয়েছে। এমনকি হালকা মেঘের আবরণও আকাশ থেকে সরে গিয়েছে। চারিদিকের নৈসর্গিক শোভা নজর কাড়ছে। তবে সেনাবাহিনীর গাড়িগুলোকে সাবলীল গতিতে যেতে দেওয়ার জন্য আমাদের থামতেই হচ্ছে। কোথাও কোথাও দূরপাল্লার কামান নিয়ে জওয়ানরা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে রেখেছে।

পথের ধারে একটা বড়সড় ধাবা দেখে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম। এখানে ধাবাগুলোয় খাবার ছাড়াও অন্যান্য পরিষেবাও বেশ উন্নত। বোধহয় পর্যটকদের সুবিধার কথা ভেবে সেইমতো ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আবহাওয়া ক্রমশ উন্নত হওয়ায় আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাদের নির্ধারিত হোটেলে ঢোকার আগে বিখ্যাত 'নুরানাং ফলস্' দেখে নেব। সেইমতো গাড়ির ড্রাইভার রিয়াজভাইকে জানিয়ে দেওয়া হল।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে আমরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। প্রায় এক কিমি পথ সিঁড়ি ভেঙে নদীর ধারের দিকে এগিয়ে চললাম। চোখে পড়েনি কিন্তু বিপুল জলরাশি পতনের গর্জন তখনই কানে আসছে। বেশ খানিকটা নামার পর তাকে দেখা গেল।

'তরলিত চন্দ্রিকা, চন্দন বর্ণা'। কষ্ট করে নামা সার্থক। সত্যি, নয়ন জুড়ানো দৃশ্য। কিছুটা সময় ওখানে ব্যয় করতেই হল। ঝরনাতলায় রসনাতৃপ্তি সহ ছবি তোলার এলাহি ব্যবস্থা লক্ষ করা গেল। আমরাও চায়ে চুমুক দিয়ে নিলাম। ওই পরিবেশে মন্দ লাগল না। তবে পুনরায় সিঁড়ি ভেঙে উপরে ওঠার ভাবনায় একটু বিচলিত হওয়াই স্বাভাবিক।

উপরে ওঠা শুরু করতেই একফালি মেঘ আবার আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমরা একটু আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। এখন বৃষ্টি নামলে ভিজতেই হবে। কোথাও কোনো আশ্রয়ের জায়গা নেই। অবশ্য শেষ অবধি নির্বিঘ্নেই গাড়িতে পৌঁছে গেলাম।

এবার আমাদের গন্তব্যস্থল সাড়ে আট হাজার ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট তাওয়াং শহরে 'মন প্যারাডাইস হোটেল'। আধঘণ্টার মধ্যেই সেখানে পৌঁছলাম। তিন দিনের জন্য এটাই হল আমাদের অস্থায়ী ঠিকানা। এই হোটেলে থেকে আমরা তাওয়াং সংলগ্ন দর্শনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো দেখব।

'মন প্যারাডাইস' হোটেলের অবস্থান যেমন ভালো, তেমনি আধুনিকতায় মোড়া। আর ততোধিক ভালো হোটেল কর্মচারীদের ব্যবহার। ম্যানেজার ও অফিসিয়াল গ্রুপ—সবই মহিলা। একতলায় অফিস কাম রিসেপশন রুম ও রেস্তোরাঁ। বলামাত্রই সুস্বাদু বাঙালি খাবার তৈরি করে দিচ্ছে।

আমাদের জন্য দোতলার ঘর বরাদ্দ হয়েছে। চারতলা হোটেলে লিফটের ব্যবস্থা আছে। ঘরে ঢুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে একতলায় ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনা করতে চললাম। কারণ তাওয়াং ভ্রমণের কিছু নিয়ম-কানুন আছে।

ভরসন্ধেয় ঠাণ্ডার যা নমুনা পাচ্ছি, রাত বাড়লে কেমন হবে তা আর বুঝতে বাকি থাকল না। ম্যানেজার ভদ্রমহিলার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করতেই তিনি সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। তার অনুরোধে চায়ে চুমুক দিতেও হল। আমরা তাঁকে ILP সহ আধার কার্ডের জেরক্স কপি দিয়ে রাতের খাবার ঘরে দেওয়ার কথা বলে উপরে উঠে এলাম।

পরদিন রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল দেখে মন খুশিতে ভরে গেল। অরুণাচলে পা দেবার পর থেকে বৃষ্টিতে মনটাই যেন হেজে গিয়েছিল। স্নান, জলখাবার সেরে গৌহাটি থেকে নেওয়া গাড়িতেই তাওয়াং-এর বিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহত্তম মঠ। খোলা আকাশের নিচেয় সোনালি বুদ্ধমূর্তি। কড়া ঠাণ্ডায় চড়া রোদের সংমিশ্রণে ঘুরতে ভালোই লাগছে। মঠ প্রাঙ্গণ থেকে শহরের

● পর্বতবেষ্টিত অরুণাচল।

● মনোলোভা বনভূমি।

অনেকটা অংশের মনোমুগ্ধকর নৈসর্গিক শোভা নজরে পড়ছে।

তাওয়াং মনেস্ট্রি দেখে হোটেলে ফিরে এসে দুপুরের খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ হল। বোধহয় টানা কদিন ভ্রমণের মধ্যে এই প্রথম।

বিকেলে আমরা চললাম তাওয়াং-এর 'ওয়ার মেমোরিয়াল' দেখতে। ওখানেই সন্ধেবেলায় 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড' দেখে হোটেলে ফিরব। বের হওয়ার সময় ম্যানেজার জানালেন যে, আগামীকাল 'বুমলা পাস' অর্থাৎ চিন সীমান্তে যাওয়ার অনুমতিপত্র ও গাড়ির বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে। গৌহাটি থেকে নেওয়া গাড়ির বুমলা পাসে যাওয়ার অনুমতি নেই। খবরটা পেয়ে আমরা নিশ্চিন্ত মনে 'ওয়ার মেমোরিয়াল' দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।

১৯৬২ সালে ভারত-চিন যুদ্ধের উপর নির্মিত এই 'ওয়ার মেমোরিয়াল' এবং তার উপর নির্মিত তথ্যচিত্র সন্ধের পর 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড' হিসেবে অডিটোরিয়ামের মধ্যে দেখানো হয়। তৎকালীন যুদ্ধে সেনাবাহিনীর সাহসিকতা ও আত্মত্যাগকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। ফেরার সময় তাওয়াংয়ের নৈশরূপে মোহিত হওয়াই স্বাভাবিক। তবে ঠাণ্ডার আধিক্য বুঝিয়ে দিচ্ছে, আমরা কোথায় আছি।

হোটেলে ফিরে আগামীকালের অভিযান নিয়ে সকলে আলোচনায় বসে পড়লাম। বিষয় একটাই। বুমলা পাসে অক্সিজেনের অভাবজনিত সমস্যা। তার জন্য কিছু প্রতিরোধের কথা ভেবে রাখাও হল। তবে এখন চাহিদা রাতের খাওয়া ও ভালো ঘুম।

১০ই অক্টোবর, ২০২৩। সকাল থেকেই সকলের মধ্যে একটা বাড়তি উদ্যোগ ও উত্তেজনা লক্ষ করা গেল। বিশেষ উদ্দেশ্যে এমন উত্তেজনা হওয়াটাই স্বাভাবিক।

রিসেপশন কাউন্টার থেকে জানিয়ে দেওয়া হল বুমলা পাস যাওয়ার জন্য বিশেষ গাড়ি হোটেলের নিচেয় অপেক্ষা করছে। আমরাও তৈরি হয়েছিলাম। এর মধ্যে কেউ কোকা-৩০ খেয়ে নিয়েছে, কেউ কর্পূর নিচ্ছে, কেউ ভুট্টার খই জোগাড় করে ব্যাগে ভরে নিয়েছে। যে যার মতো সাবধানতা অবলম্বন করছে। সঙ্গে মানসিক প্রস্তুতিও চলছে। আবহাওয়ার খবর পেয়ে ভালোমতো শীতবস্ত্র নিয়ে গাড়িতে ওঠা হল।

শহর ছাড়াতেই তাওয়াংয়ের নৈসর্গিক রূপের সাথে এক অন্য রূপ দেখা গেল। যা অনেকেরই অপরিচিত এবং এতে রোমাঞ্চিত হওয়ার যাবতীয় উপকরণও মজুত। তা হল, সেনাবাহিনীর তৎপরতা। আমাদের চোখ টানে একদিকে তো মন টানে অন্যদিকে। মাঝেমাঝেই চেকপোস্টে কাগজপত্র পরীক্ষা করে গাড়ি ছাড়া হচ্ছে।

তাওয়াংয়ে প্রবেশের পর থেকে বরফগলা ও বৃষ্টির জলের ছোট-বড় অনেক জলাশয় লক্ষ করা গিয়েছে। আজও এমন অনেক হ্রদের দর্শন পেলাম। তার মধ্যে অন্যতম পিটি সো। তিব্বতি ভাষায় সো অর্থ হ্রদ। তার আকর্ষণে গাড়ি থেকে নামতে হল। পাড় থেকে তার নয়নজুড়ানো রূপ দেখে আবার আমাদের চলা। এ পথে মুহুর্মুহু বাঁক। গাড়িতে ঠিকমতো বসে থাকাই দায়। এই অবস্থায় আমরা চলেছি আরেকটা দর্শনীয় স্থানের সাক্ষী হতে।

প্রায় গোটা তিরিশেক বাঁক পেরিয়ে খানিকটা নেমে এসে আমরা দাঁড়ালাম 'সাংগাসার' লেকের ধারে। সিনেমার দৌলতে বর্তমানে যা মাধুরী লেক নামে খ্যাত। এর অপূর্ব নৈসর্গিক শোভায় মুগ্ধ হতেই হয়।

জানা যায়, প্রবল ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্টি হয় 'সাংগাসার লেক'। যেন নীল আকাশ ঠেকে গিয়েছে স্বচ্ছ জলাশয়ে। পাড়ে পাইনের জঙ্গল। তার পেছনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণি। তীব্র হাওয়ায় জলাশয়ের উপর ছোট ছোট ঢেউগুলো নিস্তব্ধতার মাঝে নিরলসভাবে সুমধুর ধ্বনি তুলে চলেছে। এক অনবদ্য নৈসর্গিক শোভা—যা দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

এই পরিবেশে হাতে এক কাপ গরম চা ও গরম সিঙারা থাকলে মন্দ হয় না। সেনাবাহিনীর জওয়ানরা পাশেই একটা ক্যান্টিনে সে ব্যবস্থা করে রেখেছে। আর তাতে সমস্যা হচ্ছে, কেউ আর সহজে নড়তে চাইছে না। ফটোসেশনও থামছে না। কিন্তু গাড়ি ড্রাইভার হর্ন বাজিয়ে জানান দিচ্ছে, বুমলা পাসে সত্বর যাওয়ার। বেলা বাড়লে আবহাওয়া খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শেষে মাধুরীর মাধুর্য থেকে চোখ ফিরিয়ে চললাম বুমলা পাসের দিকে। কখনও সেনাবাহিনীর গাড়ির পিছনে পিছনে। আবার কখনও তাদের যাওয়ার সুযোগ করে দিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের বহুকাঙ্ক্ষিত, বহুচর্চিত ভারত-চিন সীমান্তে ১৫,২০০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট 'বুমলা পাস'।

গাড়ি থেকে নেমে বুঝলাম, যথেষ্ট ঠাণ্ডা এবং সাথে তীব্র হওয়া। যার যা শীতবস্ত্র অবশিষ্ট ছিল, সবই পরে ফেলল। সামনেই একটা গেট। তার উপর দিয়ে দৃষ্টি চলে যাচ্ছে সীমান্তে। পাশেই সেনাবাহিনীর একটা ক্যান্টিন, সেখানেই একজন আধিকারিক আমাদের অনুমতিপত্র জমা নিয়ে অপেক্ষা করতে

বললেন। পর্যটকরা কেউ সেখানে বসে চা-কফিতে চুমুক দিতে লাগল। আবার কেউ ঘুরে ঘুরে ছবি তুলতে লাগল। তারপর ৩০-৪০ জনের এক-একটা দলে দুজন পদস্থ জওয়ান সীমান্তে LOC-এর কাছে নিয়ে গেলেন। ওখান থেকে চিন সৈন্যদের অবস্থান ও গতিবিধি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

সকলকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে একজন জওয়ান এই সীমান্তের কিছু কাহিনি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। ওই জায়গায় থাকাকালীন অনেকেরই শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। তাদের গেটের কাছে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। ওখানে সেনাবাহিনীর মেডিকেল ক্যাম্প, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা আছে। অবশেষে আমরা প্রকৃতি ও পরিবেশের এক অনন্য স্বাদ গ্রহণ করে বুমলা ত্যাগ করে নামতে শুরু করলাম। হোটেলে ফিরে দুপুরের খাওয়া সারতে একটু দেরি হয়ে গেল। আজ আর বাইরে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই। তাই একটু বিশ্রাম নিয়ে ঘরে বসে স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলাম।

এবার আমাদের ঘরে ফেরার যাত্রা শুরু হবে। তবে সরাসরি নয়। অর্থাৎ আরও দু'-একটা জায়গায় বেরিয়ে ফিরব। সেই উদ্দেশ্যে আজ আমরা সুন্দরী তাওয়াং ত্যাগ করব। তিনদিন এখানে অবস্থান করায় জিনিসপত্র সব এলোমেলো হয়ে পড়েছিল। গতকাল রাতেই কিছু গোছানো হলেও সব হয়নি। বাকিটা সকালে গুছিয়ে স্নান, জলখাবার সেরে সকাল দশটা নাগাদ গৌহাটি থেকে নেওয়া গাড়িতেই আমরা বোমডিলার উদ্দেশে রওনা দিলাম।

নীচের দিকে যাব ঠিকই কিন্তু পথ ও আবহাওয়ার প্রতিকূলতা সঙ্গে করেই অতিক্রম করতে হবে আবারও সেলা টপ বা পাস।

রৌদ্রোজ্জ্বল তাওয়াং ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হল মেঘেদের ব্যস্ততা। যাওয়ার পথের চেনা ছবিটাই আবার নজরে পড়ছে। সেই বন্ধুর পথ, গহন অরণ্যের বুক চিরে কামেং নদীর সর্পিল গতি। ছোট ছোট হ্রদ। রোমাঞ্চকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে 'সেলা পাস' অতিক্রম করে আমরা 'বৈশাখী'তে সাময়িক বিশ্রামের জন্য থামলাম।

ওখানেই সেনাবাহিনীর অন্যতম কার্যালয়। পথের ধারে ক্যান্টিন। সেখানে শুধুমাত্র খাদ্যবস্তু নয়, সাধারণের ব্যবহার্য অনেক কিছু সুলভে বিক্রয় হচ্ছে। পর্যটকদের মধ্যে তার চাহিদা ভালোই। দেখলাম—শীতবস্ত্র, জামা-প্যান্ট, ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্র অনেক পর্যটকদের হাতে হাতে ঘুরছে। তবে ওই পরিবেশে জওয়ানদের দেওয়া চা বা কফিতে সবাই মজে রয়েছে।

সাময়িক বিরতি ও গরম চায়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে আবার পথচলা। চলতে চলতে পথের ধারে একটা ধাবায় দুপুরের খাবার খেয়ে প্রায় দুশো কিমি পথ পেরিয়ে বোমডিলা পৌঁছতে বিকেল গড়িয়ে গেল। আমরা উঠলাম 'নোরগে গেস্ট হাউস'-এ।

অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম কামেং জেলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর বোমডিলা। উচ্চতা প্রায় সাড়ে আটহাজার ফুট। ১৯৬২ সালে ভারত-চিন যুদ্ধের সময় বোমডিলা বহুলচর্চিত একটি স্থান। আমরা যাওয়ার সময় এই পথ ধরেই গিয়েছি। কিন্তু রাত্রিবাস করিনি। এখানে আমরা দুদিন থাকব। যাওয়ার সময় ঘন মেঘের আড়ালে বোমডিলাকে ঠিকমতো দেখাও হয়ে ওঠেনি। হোটেলে ঢুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আগে একটু বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তি দূর করে নিলাম। দীর্ঘপথের ধকল কাটিয়ে বারান্দা থেকে রাতের বোমডিলা শহরকে চাক্ষুষ করলাম। পাহাড়ের গায়ে যেন আলোকমালা সজ্জিত। তবে ঠাণ্ডার আধিক্য বুঝিয়ে দিচ্ছে। মনে হল, উচ্চতা অনুযায়ী ঠাণ্ডা বেশিই।

নিচের হোটেলের রেস্তোরাঁ থেকে রাতের খাবার তাড়াতাড়ি দেওয়া হবে জানিয়েছিল এবং নটার মধ্যে ঘরে ঘরে দিয়েও গেল। আমরাও আর দেরি না করে তার সদ্ব্যবহার করে ফেললাম। ঘরে রুম হিটার দেখে অনেকে ভ্রূ কুঁচকে ছিল। কিন্তু মাঝরাতে দুটো লেপ চাপা দিয়েও রুম হিটার ব্যবহার করতে কেউ ভুলল না।

পরদিন বোমডিলায় বেলার দিকে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকায় সকালটা ঘর-বারান্দা করে বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলাম। রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে হোটেলের বারান্দা থেকে লক্ষ করে বুঝলাম, প্রকৃতি বোমডিলাকেও সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছে। চারিদিকে সবুজে মোড়া পাহাড়ের ঘেরাটোপ। গায়ে গায়ে ঘর-বাড়ি। তার মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা এদিক-ওদিকে চলে গিয়েছে। ছোট-বড় বৌদ্ধমঠের আকর্ষণীয় রূপ। আবার মাঝে মাঝে নীল আকাশে মেঘেদের উত্থান। সবই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

বেলা বাড়লে আমরা বোমডিলার কয়েকটি দর্শনীয় স্থান ঘুরতে বেরিয়ে পড়লাম। এখানেও সেনাছাউনি বা সেনাবাহিনীর গাড়ি চলাচল যথেষ্ট। প্রাচীন বৌদ্ধমঠ বা গুম্ফা, মিউজিয়াম ছাড়াও এখানকার কারুশিল্প যথেষ্ট আকর্ষণীয়। বর্তমানে এখানে

হোমস্টে ও ট্রেকিং রুটের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। চলার পথে যেমন দূরে হিমালয়ের তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে তেমনি ১৯৬২ সালে ভারত-চিন যুদ্ধের ইতিহাসও মনে পড়ছে। তবে দুপুরের পর থেকে আবার ঘরে ঘরে মেঘেদের লুকোচুরি ও মেঘ-রৌদ্রের খেলা শুরু হয়ে গেল। সত্যিই এ যেন মেঘ-বৃষ্টির রূপকথার দেশ।

বাইরের রেস্তোরাঁ থেকে দুপুরে খাওয়ার পর্ব সাঙ্গ করে বিকেলে আমরা নোরগে গেস্ট হাউসে এসে বিশ্রাম নিতে লাগলাম। ততক্ষণে এক পশলা বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে।

এদিন সন্ধেটা আমরা হোটেলেই কাটালাম। একবার বারান্দায় গিয়ে অন্ধকারে বোমডিলার সান্ধ্যরূপ দেখছি। আবার পরক্ষণে ঘরে এসে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছি। কারণ আগামীকাল সকালে আমাদের বাড়ির উদ্দেশে গৌহাটি ফেরার কথা। অর্থাৎ অদ্যই অরুণাচলের শেষ রজনী। তাই ঠাণ্ডার মধ্যেও বারবার বোমডিলার রাতের আকাশ, শহরের আলোকসজ্জা দেখার লোভ সামলাতে পারছিলাম না। আবার মনের মধ্যে নাড়া দিতে লাগল সেই রক্তক্ষয়ী ভারত-চিন যুদ্ধের কাহিনিও। এদিন রাতেও কেউ আর বাইরে খেতে যাওয়ার সাহস দেখাল না। হোটেলের রেস্তোরাঁয় খেয়ে নেওয়া হল এবং সবাইকে রুম হিটার ব্যবহার করেই রাত কাটাতে হল।

বোমডিলার আর একটা সকাল। আরও কিছু পাওয়ার আশা। তবে ফেরার তাড়াও আছে। কারণ আমরা সকলেই সময়ের দাস। আজও দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হবে। সম্মুখের দুর্গমতা অতিক্রম করেই চলতে হবে। যেহেতু এ পথ দিয়ে এসেছি, তাই চেনাপথ। সেই পথ ধরে, বৃষ্টি মাথায় করে, ঘনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে, কামেং নদীর পাড় ধরে, 'নেচিফু সুড়ঙ্গ' পথের মধ্য দিয়ে অরুণাচল প্রদেশ সীমানা পেরিয়ে আমরা ভালুকপং পৌঁছলাম। ততক্ষণে দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। আর এখানেই আমাদের অরুণাচল প্রদেশ ভ্রমণের ইতি। তবে এই ক'দিনের যাত্রায় নৈসর্গিক শোভা ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা মনের মণিকোঠায় যে বহুকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

With Best Compliments From :

HALL MARK GOLD

MADHABI

Gold House Pvt. Ltd.

Akhanbazar, Chinsurah, Hooghly
Tel. 2680 3090 / 2681 0929

মাধবী গোল্ড হাউস প্রাঃ লিমিটেড